দ্বিতীয় অধ্যায়

জগদীশ গুপ্তের জীবন অভিজ্ঞতা : তাঁর উপন্যাসের ভিত্তিভূমি

সাগরের ঢেউগুলি যখন তীরের বুকে আছড়ে পড়ে, তখন সাগরের ভগ্ন তরঙ্গের জলরাশি আর সৈকতভূমির বালুকার মাঝে ক্ষণিকের জন্য একটা সূক্ষ্ম রেখা রচিত হয়ে যায়। পরমুহূর্তেই আবার নতুন ঢেউয়ের আঘাতে সেইরেখার বিলয় ঘটে এবং আরেকটি রেখা সৃজিত হয়ে যায়। জলরাশি আর তীরভূমির সন্ধিস্থলের ক্ষণিক রেখাটি মানব জীবনে যথার্থ সুখের মুহূর্ত নির্দেশ করে। আর অনন্ত জলরাশি এবং সুবিস্তৃত তীরের সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত যে পথ চলে গেছে তার দ্বারা দুপারেই চিত্রিত হয়ে যায় অপার দুঃখের অবিশ্রান্ত কাল-বিভাজিকা। আমরা স্বীকার করি আর নাই করি, জানি বা নাই জানি আমাদের জীবনে সুখ-দুঃখের কালসীমা এভাবেই নির্ণীত হয়ে যায়। সেই জীবন ধারাটাই নানাভাবে, নানারূপে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়—দেশ থেকে দেশান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে। প্রবহমান এই জীবন থেকেই আপন আপন অভিজ্ঞতার আলোকে সৃষ্টিশীল লেখকেরা নিজেদের মতো করেই সময়ের ক্যানভাসে জীবনচিত্র এঁকে যান। তাঁদের এই স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিভূমি রচিত হয়ে যায় তাঁদের নিজস্ব জীবন ধারা আর ঘর ও বাইরের প্রতিবেশের প্রভাবেই। সেই ভিত্তিভূমির উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে তাঁদের যাবতীয় চিন্তা, কাজকর্ম তথা সৃষ্টি প্রক্রিয়া—কী শিল্পে, কী সাহিত্যে। প্রকৃত শিল্পী এভাবেই তাঁর অভিজ্ঞতার ভিতকে মজবুত করে তোলেন। এযেন পরিপূর্ণ এবং শক্তপোক্ত ভিতের উপরেই বহুতল নির্মাণের প্রক্রিয়া জারি রাখা। ক্ষেত্র বিশেষে এর ব্যত্যয় ঘটলেই সমস্ত পরিকল্পনাটাই বাইরের যে কোন বড় আঘাতের কাছে অসহায়ত্ব বোধ করে এবং নিজের শেষ পরিণতির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হতে দেখে। সেই বহুতল ভিতের মজবুতির সাপেক্ষ শর্তেই নিজের স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারে। এরকমই বহুস্তর বিশিষ্ট জীবনে জগদীশ গুপ্ত আপন অভিজ্ঞতার আলোকে যে সাহিত্যসৌধ নির্মাণ করেছিলেন, তা বাহ্য কারুকার্যের অভাবে বেশী সংখ্যক মানব মনকে জাগিয়ে দিতে পারেনি। অথচ তাঁর নির্মাণের ভাবনায় যে কোনো অসঙ্গতি বা ত্রুটি প্রথমাবধি ছিল না, সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। তাঁর সম্পর্কে সমালোচক

আবুল আহসান চৌধুরী তাই যথার্থই লিখেছেন— ''রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রীয় রুচি, রূপ, রীতি ও বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য ও বিচূর্ণ করে আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্যে যে পালাবদল এসেছিল, জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬—১৯৫৭) ছিলেন তার প্রধান ঋত্বিক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার কার্যকারণ সূত্রে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত সংকট ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জীবন অন্বেষা ও সমাজ বাস্তবতার যে শিল্প ভুবন নির্মিত হয়েছিল, তিনিই ছিলেন তার উদ্বোধক ও শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।''[১]

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অখণ্ড বাংলাদেশের নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার গড়াই নদীর তীরবর্তী গ্রাম আমলা পাড়ায় জগদীশ গুপ্ত জন্মেছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রায় 'অদেখা' এই মানুষটির জন্মক্ষণ নিয়েও যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে। ১২৯২ বঙ্গাব্দের ২২ শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার গ্রামের সম্ভ্রান্ত এক বৈদ্য পরিবারে তাঁর জন্ম বলে উল্লেখ রয়েছে। অন্য আরেকটি সূত্র থেকে জানা যায় ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসে অর্থাৎ ১২৯৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে তাঁর জন্ম হয়েছিল।[২] আবার 'জগদীশ গুপ্ত'র কথা সাহিত্য ঃ ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে' গ্রন্থে ড. প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— 'ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত খোর্দ মেঘচামী গ্রামে জগদীশ চন্দ্রের জন্ম ১২৯২ সালের আষাঢ় মাসে, ইংরেজির ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জুন।'[৩] এই তথ্যটি দেওয়ার সঙ্গে ড. চট্টোপাধ্যায় পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন— ''সাহিত্যিক ভাতার জন্য আবেদন পত্রে প্রদত্ত তথ্য থেকে গৃহীত। অন্য একটি তথ্য অনুযায়ী জগদীশ গুপ্তের জন্ম ১৮৮৬ খ্রীঃ জুলাই মাসে কুষ্ঠিয়ায় জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী ১ম খণ্ড, তথ্যপঞ্জি ও গ্রন্থ পরিচয়, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ।''[৪]

প্রবীর বাবুর দেওয়া তথ্যটিকে মেনে নিলে জগদীশগুপ্তের জন্মক্ষণ নিয়ে শুধু নয়, জন্মস্থান নিয়েও মতান্তর থেকে যায়। সেদিক থেকে জগদীশ গুপ্তের স্ত্রীর দেওয়া তথ্যসহ অধিকাংশ গবেষক সমালোচকের মতকে প্রামান্য দিলে প্রবীরবাবুর তথ্যটিকে ভুল বলে উল্লেখ করতে হয়। এহেন মানুষটির জীবনে স্বভাবতই বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। আজীবন তিনি পরিজনদের কাছে এবং সাহিত্যিক হিসেবে সমকালের পাঠক সমালোচকদের কাছে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হয়েই ছিলেন।

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত খোর্দ মেঘচামী গ্রাম ছিল জগদীশগুপ্তের পৈত্রিক নিবাস। চন্দনা নদীর তীরবর্তী গ্রামটির প্রকৃত নাম ছিল

'মেঘচুম্বী' — যা লোকমুখে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে 'মেঘচামী' নামে পরিচিতি পেয়েছিল। ছেলে বেলায় জগদীশগুপ্তের ডাকনাম ছিল 'নারায়ণ'। বাস্তবিক নবরূপে নারায়ণেরই আবির্ভাব ঘটেছিল সেদিন—যার দুচোখ প্রত্যক্ষ করেছিল মানব জীবনের বিচিত্রতর স্তর পরম্পরাকে। কবি জীবনানন্দ দাশ যেমন আসলে পূর্বে 'দাশগুপ্ত' পদবিধারী ছিলেন তেমনি জগদীশ গুপ্তরও কৌলিক পদবী ছিল সেনগুপ্ত। কিন্তু তিনি সাহিত্য চর্চা করতে শুরু করলে পদবীর 'সেন' অংশটি কখনো ব্যবহার করেননি। অবশ্য এই 'সেনগুপ্ত' পদবীটি তাঁর পূর্বপুরুষদের ব্যবহার করতে দেখা যায়নি তেমনভাবে। প্রথমদিকের দু-একটি লেখায় লেখকের নাম হিসেবে 'জগদীশচন্দ্র গুপ্ত' নামটি ব্যবহার করেছেন তিনি। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে কল্লোল পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ সংখ্যায় তাঁর 'দৈবধন' নামে যে গল্পটি বেরিয়েছিল; কিংবা পরে 'কল্লোল' সহ 'কালিকলম' ও 'উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি মাত্র গল্পেই লেখকের নাম পাওয়া গেছে জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ব্যতিক্রমী জীবন ভাবনায় অভ্যস্ত মানুষটি অল্পকালের মধ্যেই নিজের নামের মাঝের 'চন্দ্র' অংশটিও বর্জন করেছেন অবহেলায়। এভাবেই নিজেকে চিনিয়ে দিয়েছেন সমকালে প্রায় অবজ্ঞাত এই মানুষটি। নাম সংক্ষিপ্তকরণ বিষয়ক পরিচিতি আমরা পেয়ে যাই তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বিনোদিনী'র বিজ্ঞাপণে। এবিষয়ে ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় স্পষ্টতই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন— ''কালি কলম পত্রিকার চৈত্র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেখা যায়।''[৫] জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পের বই 'বিনোদিনী'র আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এরই সঙ্গে।

জগদীশ গুপ্তের পিতামহ আনন্দমোহন ছিলেন তৎকালের ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার ডাকসাইটে আইন ব্যবসায়ী। সেই সঙ্গে তাঁদের ছিল জোতদারী—মেঘচামী গ্রামে তাঁদের ছিল দিগন্ত বিস্তৃত শস্য ক্ষেত্র — যার ফসল উঠলে উৎসব ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে গৃহের প্রায় সকলেই গ্রামের বাড়ীতে যেতেন। সকলের মিলনের আনন্দে পরিবেশটাই সম্পূর্ণ বদলে যেত। এই আনন্দ মোহনই ছিলেন কৌলিক বৃত্তি গ্রহণকারী গুপ্ত পরিবারের শেষ পুরুষ। যদিও আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে— [জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬—১৯৫৭)] জগদীশ গুপ্তের পিতামহের নাম উল্লেখ করেছেন আনন্দমোহন নয়, আনন্দ চন্দ্র গুপ্ত। এই আনন্দ মোহন বা যাই হোন না কেন, তাঁর নামানুসারেই জগদীশ গুপ্তের পৈত্রিক বাড়ীটির নাম ছিল 'আনন্দ ভবন'। একান্নবতী পরিবারে জগদীশ গুপ্তের পিতা কৈলাস চন্দ্ররা ছিলেন দুই ভাই— কৈলাসচন্দ্র ও প্রসন্নচন্দ্র। এঁরা দু'জনেই ছিলেন প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী— কুষ্ঠিয়া জেলা

আদালতে তাঁরা যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রসার লাভ করেছিলেন। সমকালের ব্রাহ্মধর্মের ঢেউ এসে 'আনন্দভবন' -এ লেগেছিল। যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে জগদীশ গুপ্তের পিতা কৈলাসচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতেন এবং তিনি দীক্ষিত ব্রাহ্ম হলেও ব্রাহ্মসমাজের সভা সমিতিতে নিয়মিত যোগ দিতেন। এবিষয়ে তাঁর সহযোগী ছিলেন প্রতিবেশী আইনজীবী দুর্গাচরণ বিশ্বাস এবং রাইচরণ দাস। এরকম ব্রাহ্ম সমাজের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ কৈলাসচন্দ্র ও তাঁর সহধর্মিণী সৌদামিণী দেবী ছয় সন্তানের পিতামাতা ছিলেন। এই ছয় জনের মধ্যে পাঁচজনই পুত্র সন্তান এবং একজন কন্যা সন্তান ছিল। যদিও অগ্রজ যতীশচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ জগদীশ ছাড়া অন্যান্য ভাই বোনেরা অকালেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে দিয়েছিল। গৃহের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে জগদীশ ছিলেন সকলের আদরের দুলাল। তাঁর অগ্রজ যতীশচন্দ্র ওকালতিতে যথেষ্ট প্রতিপত্তি করেছিলেন। এরকম একটি 'আইন বিষয়ক' পরিবারে জগদীশ গুপ্ত ছিলেন মূর্তিমান ব্যতিক্রম।

জগদীশ গুপ্তের পিতৃব্য কৈলাসচন্দ্রের শাশুড়ি দাক্ষায়ণী দেবী ছিলেন বালক জগদীশের কবি হয়ে ওঠার প্রেরণা নামক সোপান। এই মহিলা প্রথাগত লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রবল সাহিত্যানুরাগী। শুধু তাই নয় একজন স্বভাব লেখিকা হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এতদঞ্চলে। তিনি নাকি ভালো কবিতা রচনাই শুধু করতেন তাই নয়, সেইসঙ্গে চৈত্রসংক্রান্তির গাজন উৎসবের জন্য গান বেঁধে নিজেই সুর দিতেন। লেখাপড়ার বাতাবরণ বিশিষ্ট 'আনন্দ ভবন' আর এরকম একজন বিদূষী মহিলার সাহচর্য পেয়ে জগদীশ গুপ্তের মনোভূমিতে উত্তরকালের সাহিত্য বীজটি উপ্ত হয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু লেখকের মা সৌদামিণী দেবীও ছিলেন লেখাপড়া জানা সভ্য পরিবারের সন্তান। আবার গল্প-উপন্যাস পাঠেও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল — যাবতীয় প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে তিনি বিভিন্ন লেখকের রচনাবলী সংগ্রহ করে পড়তেন। এবিষয়ে উত্তর কালে লেখকের স্ত্রী চারুবালা দেবী স্মৃতি চারণা করতে গিয়ে বলেছেন— ''শ্বশুর বাড়ী কুষ্ঠিয়া আসিয়া দেখিলাম শ্বশ্রূমাতার কেনা অনেক উপন্যাস। বঙ্কিমবাবুর, মধুসূদন দত্তের, রমেশ চন্দ্রের গ্রন্থাবলী ঘরে অনেক।''[৬]
প্রসঙ্গত জীবনানন্দ দাশের মা কুসুমকুমারী দেবীর কথা মনে পড়ে। ইনি সমকালের একজন কবি হয়ে উঠেছিলেন— যিনি অনায়াসেই লিখেছিলেন—

''আমাদের দেশে সেই ছেলে হবে কবে

কথার চেয়ে যে কাজে বড়ো হবে।”[৭]

এই সুপ্ত বাসনা হয়তো সৌদামিণী দেবীরও ছিল। আনন্দ ভবনের সেই মুক্ত পরিবেশে, মায়ের স্নেহের ছায়ায় বেড়ে ওঠা জগদীশ গুপ্ত পরবর্তীকালে শৈশবের সেই পরিবেশ থেকেই সাহিত্য চর্চা করার অন্তর্প্রেরণা নিশ্চয়ই পেয়ে থাকবেন।

প্রসঙ্গত জগদীশগুপ্তের জীবনী বিষয়ক একটি বংশ তালিকার উল্লেখ করা যায়।

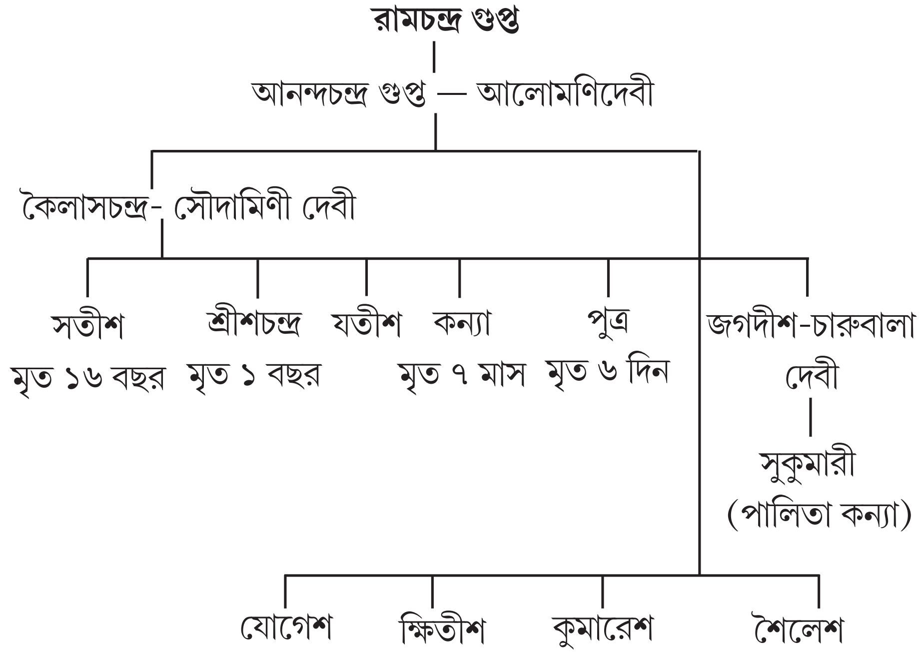

কুষ্ঠিয়ার ‘আনন্দভবন’ ছিল বালক জগদীশের জীবনের এক বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু। এই গৃহেরই সন্তান হিসেবে তিনি মায়ের অপরিসীম স্নেহের পাশাপাশি পেয়েছেন পরিবারের সকলের কোমল সাহচর্য। সেইসঙ্গে প্রকৃতিও যেন তার ডালা ভ’রে নজরানা সাজিয়ে দিয়েছিল। ফুল ফলের বাগান পরিবেষ্টিত সেই গৃহের বিবরণ দিতে গিয়ে সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ লিখেছেন— ‘‘কুষ্টিয়ায় আমাদের আমলা পাড়ায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডান দিকের পথ ধরে বাঁয়ে ঘুরলেই বাঁ হাতে যে কাঁচা বাড়িটা ছিল, তার প্রাচীরের ভেতরে ছিল একটা বেগন ভোলিয়ার গাছ। তার ডাল এসে ঝুঁকে পড়তো বাইরে। আর তাতে ফুটে থাকতো অজস্র লালরঙের পাতা ফুল।... তার পাশেই বাইরে শুকনো ড্রেনে ঝরে পড়তো ফুলগুলো। আমরা সেগুলো কুড়িয়ে আনতাম। আর মনে মনে ভাবতাম, ঐ ফুলগাছের মালিকের কি সৌভাগ্য।”[৮] প্রকৃতির ভালোবাসার স্পর্শধন্য এই বাড়ীটি থেকে জগদীশ গুপ্তের বিচ্যুতি ঘটেছিল

কালবৈশাখীর ঝড়ে বৃন্তচ্যুত মুকুলের মতই। তাঁর অগ্রজ যতীশচন্দ্র পিতামহের নামাঙ্কিত স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই বাড়ীটি পরবর্তীকালে বিক্রি করে দেন। এবং ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর এপার বাংলার কলকাতার কাছে বেলঘরিয়ায় তাঁর ছেলের কাছে এসে আশ্রয় নেন। হাতবদল হয়ে বাড়ীটির রূপও বদলে যায়। জগদীশের চেতনায় তার বেদনাবহ একটা ছাপ মুদ্রিত হয়ে যায়। আনন্দভবন থেকে, প্রিয় মাতৃভূমি থেকে তাঁর চিরবিচ্ছেদ ঘটে গেল। এর উপরে তাঁর নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সবই যেন নিয়তি নিয়ন্ত্রিত।

প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যেমন 'পথের পাঁচালী'র অপুর প্রথম পাঠগ্রহণ শুরু হয়েছিল, তেমনি জগদীশ গুপ্তের বিদ্যাশিক্ষার সূচনা হয় কুষ্টিয়ার তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত রামলাল সাহার বিদ্যামন্দিরে। সেই সময়ের কৃতী কুষ্টিয়াবাসী বঙ্গসন্তানেরা প্রায় সকলেই এই পাঠশালায় পড়াশুনা করেছিলেন। রামলাল সাহা আবার হিন্দুধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডীকে ভেঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিজে কাব্য চর্চা করতেন। এঁরই প্রেরণাতেও বালক জগদীশের মাথায় কবিতার ভূত চেপেছিল। উত্তরকালে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত 'দীপিকা' (১৯৩২) পত্রিকায় রামলাল ও জগদীশের কবিতা ছাপা হয়েছে। পাঠশালায় পাঠরত অবস্থাতেই অপুর মধ্যে বিশ্ব প্রকৃতিকে জানবার যে নিরন্তর ক্ষুধা পেয়ে বসেছিল বালক জগদীশের মধ্যেও তারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। তবে দিদি দুর্গার সাহচর্যে যখন বিশ্বপ্রকৃতির সান্নিধ্যে অপুর মধ্যে একটা কবিসত্তার বিকাশ ঘটতে শুরু করেছিল; জগদীশ গুপ্তের সেই ক্ষুধা জাগ্রত হয়েছিল— কিন্তু তার মধ্যে অপুর সেই অনাবিল ভাবনা প্রবাহ বয়ে যায় নি। বরং মানব সম্পর্কের নিষিদ্ধ দিকটাতেই তার অনাবশ্যক কৌতূহল জন্মেছিল। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে জগদীশগুপ্ত যখন কুষ্টিয়ার হাইস্কুলে পড়তে শুরু করলেন তখন তাঁর সেই নিষিদ্ধ কৌতূহলের গোপনে অঙ্কুরোদ্গম হতে থাকে। ছাত্র হিসেবে তিনি মেধাবী হলেও পড়াশুনায় কোনো কালেই খুব বেশী মনোযোগী ছিলেন না। বরং সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এই সময় থেকেই লক্ষ্য করা যায় প্রবলভাবে। স্কুলে পাঠ্য বইয়ের তলায় বাড়ী থেকে নিয়ে আসা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রেখে তিনি চুপিচুপি সেইসব বই গ্রোগ্রাসে গিলতেন। একথার সমর্থন রয়েছে বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত 'জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলীর' লেখক পরিচিতি অংশে। এই পরিচিতিতে আমরা দেখি— ''তাঁহার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে হাইস্কুলের ছাত্রাবস্থায় ১৫/১৬ বৎসর বয়সেই, আর ভারি অনুচিত উপায়ে। স্কুল পাঠ্য সংস্কৃত পুস্তকের

পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্নকৃত অর্থপুস্তকের কলেবর ছিল বিরাট পি.এম. বাক্‌চির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার মত। এই অর্থ পুস্তক সামনে খুলিয়া রাখিয়া জগদীশ তাহার নীচে রাখিতেন মায়ের কেনা বঙ্কিমবাবুর কালো কালো মলাটের উপন্যাস।"[৯] এই অনধিকার চর্চাহেতু অকাল পরিপক্কতার জন্য শাস্তি তাঁকে পেতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্তরস্থ সত্তায় সাহিত্য ক্ষুধার কোনো ক্ষণিক নিবৃত্তিও হয়নি। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে গোপনে চলতে থাকে তাঁর কবিতা চর্চা। এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ কবি ছিলেন সমকালের রবীন্দ্রচেতনার বিপরীত বলয়ের কবি ব্যক্তিত্ব ঢাকার ভাওয়াল পরগণার কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস। ইনি নারীর শরীরী সত্তা মিশ্রিত প্রেমেরই জয়গান গেয়েছিলেন। অস্থি মাংসসহ নারীকে ভালোবাসার কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁরই প্রেরণাতেই জগদীশ গুপ্ত তাঁর কবিতাতেও অভ্রান্ত নারী তৃষ্ণার কথা নিয়ত লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছিলেন তাঁর গোপন খাতাটিতে। কিন্তু অচিরেই বাড়ীর অভিভাবকদের হাতে সেই খাতাটি ধরা পড়ে। তাঁরা সেইসব কবিতা পড়ে শুধু অবাক নয়, পড়ে শিউরে উঠলেন এবং কবিতার স্রষ্টাকে কঠোর শাস্তি দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেননি। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী সেই কবিতা চর্চার ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখেছেন— "স্কুলে পড়বার সময়ে ১৫/১৬ বছর বয়স থেকেই কবিতা লিখে সাহিত্য সরস্বতীর সেবা আরম্ভ করেন গোপনে। কারণও ছিল। ধরা পড়ে যাবার পরে অভিভাবকেরা আবিষ্কার করেছিলেন, সেসব কবিতা ছিল 'কুঅভিলাষপূর্ণ।"[১০]

নারীর শরীরী ভালোবাসা সম্বলিত সেইসব 'কুঅভিলাষপূর্ণ' কবিতা চর্চার কারণে তাঁকে অচিরেই কুষ্টিয়া ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও তিনি কবিতা তথা সাহিত্য চর্চা ছাড়েন নি। গল্প উপন্যাস রচনার পাশাপাশি কবিতা রচনা তিনি করে গেছেন। তাঁর অন্তত দুটি কবিতার বইয়ের কথা জানা যায়— 'অক্ষরা' (১৯৩২) এবং 'কশ্যপ ও সুরভী' (১৯৩৭)। এছাড়াও তাঁর 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' (১৯৩৫) গল্পগ্রন্থে 'তুলসী' নামে আরেকটি কবিতা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন ছিল, কিন্তু সেই বই প্রকাশের কোনো প্রমান পাওয়া যায় না। উত্তরকালে তাঁর এই কবিতা লেখা সম্পর্কে স্ত্রী চারুবালা গুপ্ত জানিয়েছেন— "কবিতা ইনি খুব লিখিতেন, আমি কুষ্টিয়া এসে দেখলাম কবিতা লেখেন। ২/১টা নিয়ে পড়তাম। তখন কাহারও বিবাহ হলে প্রীতি উপহার লিখে দিতে হত। এই প্রকার বন্ধু বান্ধব অনেকেই আসত কিন্তু কাকেও নিরাশ করতেন না। কবিতা লেখার জন্য অনেক সময় বকুনিও খেতে হত—এসব বোধহয়

লুকিয়েই হত। ছেলে কবিতা লিখে ফাজিল হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি।"[১১] অভিভাবকেরা দৃঢ় হাতে 'ফাজিল' ছেলেটিকে মানুষ করবার স্বপ্ন নিয়ে সুশিক্ষার জন্য কুষ্ঠিয়া থেকে কলকাতায় পাঠালেন। ১৯০৪ খ্রীঃ তাঁকে ভর্তি করানো হল সিটি কলেজিয়েট স্কুলে। এই স্কুল ছিল সেই সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব অধ্যক্ষ হেরম্ব চন্দ্র মৈত্রর কঠোর নিয়মশাসিত নীতিনিষ্ঠার অচলায়তন। সেইসঙ্গে মামা ও দাদাদের কঠোর তত্ত্বাবধান এবং নজরবন্দীতে তাঁকে বাঁধার চেষ্টারও ত্রুটি রাখা হল না। এ বিষয়ে জানা যায়— "জগদীশ কলকাতায় নির্ব্বাসিত হইলেন (১৯০৪)। মেসের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর কঠিন শাসনের অধীনে তাঁহাকে রাখা হইল—গতিবিধি ও সংযোগ নিয়ন্ত্রিত হইল।"[১২] স্বাধীন জীবনে অভ্যস্ত জগদীশ গুপ্ত শহরের ইট-কাঠ-পাথরের জান্তব জীবনে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার সংগ্রামে নেমে পড়লেন। ১৯০৫ খ্রীঃ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হন।

স্বভাবের দিক থেকে বরাবরই খামখেয়ালি জগদীশ গুপ্ত এরপর বিপন কলেজে (যার বর্তমান নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) এফ.এ তে ভর্তি হন। কিন্তু দুবছরের মাথায় ১৯০৭ খ্রীঃ পরীক্ষা না দিয়েই তিনি পড়াশুনায় ইতি টানলেন। পরীক্ষার আগে দীর্ঘ চল্লিশ দিন টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কলেজে যেতে পারেননি। জ্বর ছাড়লেও দুর্বলতা কাটিয়ে তিনি কলেজ মুখো হতেই পারলেন না। বেশিদিন কলেজ কামাই করার জন্য সে বছর কলেজ কর্তৃপক্ষ আর ওঁকে পরীক্ষায় বসতে অনুমতি দেয়নি। তখন তিনিও আর রাগ করে পড়লেন না। যদিও তাঁর মামা তাঁকে নিয়ে এরপর বিভিন্ন কলেজে ভর্তির জন্য ঘুরলেন। কিন্তু কোনো কলেজেই সিট না থাকায় তাঁর আর ভর্তি হওয়া হল না। তখন তিনি মনঃকষ্টে আর না পড়ার কথা তাঁর মামার কাছে ব্যক্ত করেন। মামা একথা শুনে দুঃখ পেলেন এবং তিনি কুষ্ঠিয়ার বাড়ীতে সে কথা জানিয়েও দেন। আইনজীবী পিতার স্বপ্ন ছিল কনিষ্ঠ পুত্রকে নিশ্চয়ই ওকালতি বা মোক্তারী পড়াবেন। কিন্তু ছেলের এহেন সিদ্ধান্তে তিনি যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে পরিবারের অন্যান্যরাও ক্ষুব্ধ হলেও জগদীশ গুপ্ত তাঁর সিদ্ধান্তেই অটল থাকেন। মাঝপথে এভাবে পড়া ছেড়ে কুষ্টিয়ায় ফিরলে পিতাপুত্রের মধ্যে এনিয়ে যে কথোপকথন হয়েছিল, সে সম্পর্কে চারুবালা দেবী জানিয়েছেন— "কুষ্টিয়ায় আসার পর শ্বশুর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিরে তুই আর পড়বি না!' তারপর দুই-একবার জিজ্ঞাসা করবার পর কথার জবাব পাওয়া গেল। শ্বশুর মহাশয় বললেন যে, 'পড়বি না খাবি কি করে?' জবাবে বললেন সর্টহ্যাণ্ড

শিখব। শ্বশুর মহাশয় আর কিছু না বলে সরে গেলেন।"[১৩]

পিতা কৈলাসচন্দ্র পুত্রের এক গুঁয়েমি স্বভাব সম্পর্কে সবিশেষ পরিচিত ছিলেন বলেই আর কোনো উচ্চবাচ্য করেননি ছেলের পড়াশুনা ছেড়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে। প্রথাগত শিক্ষায় ছেদ টেনে দিয়ে জগদীশ গুপ্ত কুষ্টিয়া থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন নতুন ভাবে জীবন গড়ার ভাবনা নিয়ে। বাংলাদেশের আর পাঁচজন সাধারণ ছেলেদের মতই নিজের জীবন সম্পর্কে একটা পরিকল্পনার ছক করলেন। সমকালে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ 'আনন্দভবনে'র মানুষজনদের কতটা প্রভাবিত করেছিল তা বিশেষ জানা যায় না। কেননা জগদীশ গুপ্ত যখন পড়াশুনায় ইতি টানছেন তখন লর্ড কার্জন সাহেবের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল। যা চলেছিল ১৯১১ খ্রীঃ পর্যত। অথচ ১৯০৭ সালে দাঁড়িয়ে পড়াশুনার পাট চুকিয়ে জগদীশবাবুর মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন কোনো জড় তুলেছিল কিনা তার কোনো পরিচয় তাঁর ব্যক্তি জীবনে কিংবা সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' তাঁর মনের গহনে কতটা আলোড়ন তুলেছিল সে সম্পর্কে তিনি নীরবই থেকেছেন। সেজন্যই তাঁকে আর পাঁচজন সাধারণের সঙ্গেই উপমিত করলাম। ভাবতে অবাক লাগলেও একথা সত্যি যে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ তেমন ভাবে হয়তো কুষ্টিয়ার সেই বাড়ীটিতে এসে পৌঁছায় নি কখনো। তবে এটুকু জানা যায় তখন গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতা ও সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় জগদীশ গুপ্তের বাড়ীতে আসতেন এবং তাদের পরিবারের সঙ্গেও একটা সুসম্পর্ক বজায় ছিল। এই তারাশংকরই পরে ভারতসরকারের কাছে এই মানুষটির জন্য সাহিত্যিক ভাতার সুপারিশ করেছিলেন— একথা পরে আলোচনায় আসবে। জগদীশ গুপ্ত এরপর পিতৃব্যর মতো কিংবা অগ্রজের পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত উকিল না হতে চেয়ে কলকাতার কমার্শিয়াল ইন্সস্টিটিউট থেকে শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ শিক্ষায় নির্দিষ্ট কোর্স পাশ করেছেন। কিন্তু তারপরেও দীর্ঘ সময় তিনি বেকার অবস্থাতেই কাটিয়েছেন কুষ্টিয়ার বাড়ীতে বসেই। তাঁর পিতা তখনো নিয়মিত আদালতে যেতেন। চাকরীর যা খবর-টবর আসতো তা অনেকটাই দূরদেশের বলে তাঁর পিতামাতা মত দেননি। প্রথম চাকরীর সুযোগ এসেছিল শিলং থেকে, ৫০ টাকা মাইনের কিন্তু তাঁর পিতামাতার কেউ চাননি ছেলে দূরদেশে গিয়ে একা একা থাকুক।

রিপন কলেজে পড়বার সময়ই জগদীশ গুপ্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কুষ্টিয়ারই

খোকসা থানার ওসমানপুর গ্রামের যদুনাথ সেনগুপ্তের কন্যা চারুবালার সঙ্গে। এই বিবাহের স্মৃতি কিংবা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জগদীশগুপ্ত নিজে থেকে কোনো কথাই বলে যাননি। এ বিষয়ে যা কিছু জানা যায় সবই তাঁর স্ত্রীর দেওয়া তথ্য থেকেই। বিয়ের সময়—১৩১৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস — সেই হিসেবে জগদীশবাবুর বয়স তখন ২১ আর তাঁর স্ত্রীর বয়স ১২। বরাবর কম কথা বলায় অভ্যস্ত লাজুক প্রকৃতির এই মানুষটির বিবাহানুষ্ঠানে অনেকেই 'প্রীতি উপহার' হিসেবে কিছু লিখে এনেছিলেন। সেইসব আমন্ত্রিতরা জানতেন বর একজন ভালো কবিতা লিখিয়ে। তাই যারা কবিতা লিখে এনেছিলেন, তারা বরবেশী জগদীশ বাবুকে সেইসব কবিতা দেখিয়ে জানতে চেয়েছেন— কেমন হয়েছে কবিতা। একবারমাত্র সলজ্জ চোখ বুলিয়েই তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছেন— 'বেশ ভালো।' সংক্ষিপ্ত এই উত্তর শুনেই প্রশ্নকর্তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ীতে যাওয়া এবং সেখানে নববধূর বরণ বিষয়ে স্মৃতি চারণায় চারুবালা দেবী জানিয়েছেন— ''বিবাহের পর দেশের বাড়ীতেই যাইতে হইল। আমাদের বাড়ী হইতে নদীর ঘাট বর্ষাকালে দুই মিনিটের রাস্তা, সেই টুকুন রাস্তা দুজনে একসঙ্গে পালকীতে আসিতে হইল সঙ্গে বাবা এবং আরও অনেকেই ছিলেন। পালকী মাটিতে রাখিতেই বাবা এসে হাত ধরে পালকী হইতে নামিয়ে নিয়ে নৌকার কাছে গেলেন। প্রকাণ্ড পানসী নৌকা। শ্বশুর মহাশয় নৌকার উপর হইতে 'এসো মালক্ষ্মী এসো' বলে হাত ধরে নৌকায় তুলে নিলেন।''[১৪]

পড়াশুনার মাঝেই পিতার ইচ্ছায় বিয়েটা সেরেই জগদীশবাবু বিবাহের আটদিন পরেই কলকাতায় ফিরে যান। কারণ কলেজ কামাই হয়ে যাবে—এটা তাঁর পিতা চাননি। ফলে নববধূকে একাকিনী কয়েকদিন শ্বশুর বাড়ীতেই কাটাতে হয়। এবং দিন কয়েকবাদে তিনিও ওসমানপুরে পিত্রালয়ে ফিরে যান। সে সময়ের সামাজিক জীবনে বাঙালী পরিবারে পর্দাপ্রথা ছিল ভীষণ কড়াকড়ি ভাবেই। অন্তঃপুরের অন্তরালেই মেয়েদের কাটাতে হত। চারুবালা দেবীর ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যত্যয় হয়নি। এবিষয়ে আবুল আহসান চৌধুরীও লিখেছেন— ''গুপ্ত পরিবারে পর্দার কড়াকড়ি ছিল। পুত্রবধূ শ্বশুরের বাক্যালাপ হয়নি কখনো। অন্তঃপুরের মধ্যেই মেয়েদের জগৎ ছিল সীমাবদ্ধ।''[১৫] বিয়ের পর সুদীর্ঘকালের (প্রায় পঞ্চাশ বছর) দাম্পত্য জীবনে জগদীশবাবু একজন আদর্শনিষ্ঠ স্বামীর মতই তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে গেছেন। অত্যন্ত সংযমী এই মানুষটির জীবনের এই বিশেষ পর্বেও তাঁর স্বভাবের কোনো

পরিবর্তন হয়নি। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে তাঁর কোনো আতিশয্য ছিল না। কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে এই সম্পর্কের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিবোধ ছিল। নিঃসন্তান এই দম্পতি পরস্পর পরস্পরকে আন্তরিকভাবেই ভালোবাসতেন। তাঁদের প্রতিদিনের জীবনে কোথাও কোনো অশান্তির কালো মেঘ জমে ওঠেনি কিংবা মনের গহীন লোকে কোনো মানসিক অশান্তিও ছিল না। স্ত্রীর প্রতি নিঃশব্দে সমস্ত কর্তব্য পালন করে গেছেন জগদীশবাবু। অসুস্থ স্ত্রীর জন্য নিজে হাতে রান্নাবান্না করা, স্ত্রীর অসম্মানের কারণ ঘটলে দৃঢ়চিত্তে তার প্রতিকার করা এমনকী কখনো কোনো ব্যাপারে স্ত্রীর কোনো সিদ্ধান্ত মনঃপুত না হলেও তাকে খুশি মনে মেনে নেওয়ার মত উদারতা জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন। এবিষয়ে তার মধ্যে একজন সহৃদয় দায়িত্বশীল স্বামীকে অনায়াসেই খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ীর খ্যাতনামা আইনজীবি ছিলেন জগদীশ গুপ্তের শ্বশুর মশাই যদুনাথ সেনগুপ্ত। বসবাসের জন্য রাজবাড়ী চত্বরেই বাড়ী নির্মাণ করেছিলেন যদুনাথ বাবু। একদিকে পর্দাপ্রথা অন্যদিকে সেইসময় সেখানে মেয়েদের লেখাপড়ার খুব ভালো ব্যবস্থা ছিল না। উপরন্তু প্রায় বাল্যবিবাহের কারণেও চারুবালা দেবীর পড়াশুনা খুব বেশী এগোয়নি। বিদ্যালয়ের সীমিত বিদ্যাকে সম্বল করেই শ্বশুর গৃহে তিনি পড়াশুনার পরিবেশ পেয়ে নতুন করে পড়াশুনায় আগ্রহী হয়ে উঠেন। বাড়ীতে রামায়ণ-মহাভারতের মতো ধর্মগ্রন্থাদিতেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকলেও শ্বশুরবাড়ীতে শাশুড়ীর সাহচর্যে সাহিত্য পাঠে তাঁর নিজস্ব চিন্তায় দুয়ার খুলে যায়। এরফলে তিনি স্বামীর সাহিত্য রচনার প্রেরণা যেমন হয়ে ওঠেন তেমনি স্বামীর লেখারও অনুরক্ত হন। মধুসুদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের পাশাপাশি হেমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রচনাও তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। এসব ক্ষেত্রে স্বামী হিসেবে জগদীশ গুপ্ত স্ত্রীর সাহিত্য চিন্তার প্রসারে এবং রুচিবোধ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কখনোই প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেননি।

জগদীশ গুপ্তের ছেলেবেলা থেকেই তিনি সকলের চাইতে কোথাও যেন একটু স্বতন্ত্র —এই বোধের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল ছিল তাঁর প্রিয় খেলা। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি যে ছেলেবেলায় শুধু ফুটবল খেলেছেন তাই নয় চল্লিশ পেরিয়ে গেলে যখন সকলে প্রায় খেলা ছেড়ে দেন সেই বয়সেও তিনি কিশোর ও যুবকদের সাথে অনায়াসেই খেলায় যোগ দিতেন। ছোটদের সঙ্গে নির্দ্বিধায় ফুটবলের সঙ্গে

সঙ্গে মার্বেল দিয়েও খেলেছেন। তবে যখনি দেখেছেন, মাঠে কোনো খেলোয়ার অন্যায় আচরণ করছে তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে যোগ্য শাস্তি দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এই ভাবেই বালক জগদীশ আর পাঁচজনের মতো হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের থেকে আলাদাও হয়ে উঠেছিলেন। জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রেই এই রকম অন্যায়, অপরাধের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ চিত্তে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পিছুপা হননি। আমৃত্যু তিনি তাঁর এই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বকে ধরে রেখেছিলেন।

সমাজের যেকোনো স্তরের নারীদের প্রতি জগদীশ বাবুর যে সম্ভ্রমবোধ তারও ভিত গড়ে উঠেছিল তাঁর ছেলেবেলাতেই। এক্ষেত্রে তাঁর মায়ের প্রভাব ছিল তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশী। সমাজে পতিতা বলে যারা অপাংক্তেয় তাদের সম্পর্কেও জগদীশবাবু শ্রদ্ধার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন আজীবন — কী সাহিত্যে কী ব্যক্তিগত জীবনে। এইসব পতিতা নারীদের সঙ্গে একেবারে ছোট্টবেলা থেকেই তাঁর একটা সংযোগ গড়ে ওঠার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছিল। কুষ্ঠিয়ায় তাঁদের বাড়ীর খুব কাছেই একটা পতিতা পল্লী ছিল। সেখানে অনেক ঘর পতিতার বাস ছিল। নিজস্ব বৃত্তির পাশাপাশি ঐসব নারীরাই লোকের বাড়ীর ঝিয়ের কাজ করত, আঁতুর পাহারা দিত। জগদীশ বাবু জন্মাবার পর তাঁর পাঁচ ছয়মাস বয়সের সময় থেকেই এইসব নারীরা শিশুটিকে তাদের কাছে নিয়ে সারাদিন রেখে দিত। আদর যত্ন করে খাওয়াত একটু বড় হলে মালাচন্দন দিয়ে কৃষ্ণঠাকুর সাজিয়ে হাতে বাঁশি ধরিয়ে দিতে আনন্দ করত। একবার অল্প বয়সে জগদীশবাবু ড্রেনের মধ্যে পড়ে গেলে ওরাই তাকে ড্রেন থেকে তুলে বাঁচিয়ে ছিল। পরে আগুন লেগে ওদের ঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেলে ওরা তখন বাধ্য হয়ে অন্যত্র চলে যায়। এইসব নারীদের মধ্যে গিরিবালা নাম্নী এক নায়েব রক্ষিতার কথা চারুবালা দেবী বলেছেন, যে ছোট্ট জগদীশকে ভীষণ স্নেহ করত। মাঝে মাঝে তাদের বাড়ীতেও চলে আসত গিরিবালা। এবং জগদীশ বাবুর খোঁজ করত। চারুবালা দেবী এ বিষয়ে জানিয়েছেন— ‘‘গিরিবালা মধ্যে মধ্যে মা মা করে বাড়ীতে এসে শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলত। এঁর খোঁজ খবর লইত ছোড়দা কোথায় প্রভৃতি, কোলকাতায় কলেজে পড়ে শুনে খুব খুশী।’’[১৬]

এই গিরিবালাই উত্তরকালে ‘লঘুগুরু’ উপন্যাসের উত্তম রূপে প্রতিভাত। কিংবা সুন্দরী চরিত্রের বেশে উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্তের চেতনায় শৈশবের এই নারীরা কতটা জাগরূক ছিল উত্তম-সুন্দরী কিংবা টুকীর পাপের পথে নেমে যাওয়ার মধ্যদিয়ে লেখক সেটাই

চিত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয় সেইসব পতিতাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা হয়ে তাঁদের বাড়ীর কাছাকাছি রাস্তার ধারে মুড়ি মুড়কি বাতাসার পসরা সাজিয়ে নিয়ে বসলে বালক জগদীশ তার ভালোবাসার টানে নানা সময়ে তাকে বিরক্ত করতে ছুটতো ভাইয়েরা মিলে। তাদের দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ সেই বৃদ্ধা জগদীশ বাবুর মায়ের কাছে নালিশ করে তবেই রেহাই পেতেন। আবার অনেকদিন ছেলেদের না দেখলে নিজে থেকেই ডেকে নিয়ে 'পকেট ভর্তি করে মুড়ি মুড়কি' প্রভৃতি খাবার তুলে দিয়ে তৃপ্তি বোধ করতেন। পতিতার মাঝেও মাতৃরূপের এই প্রকাশের দ্বারাই উত্তমকে সৃষ্টি করেছিলেন জগদীশ গুপ্ত।

পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের প্রতিপত্তি ও মর্যাদার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সামান্য টাইপিস্টের চাকরী দিয়ে জগদীশ গুপ্তের কর্মজীবনের পথ চলা শুরু হয়েছিল। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন একক সিদ্ধান্তের অধিকারী। সকল লোকের মাঝে বসে নিজের মুদ্রা দোষে একা আলাদা হয়েছেন, নিজের জীবন পথে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন, কিন্তু হাল ছাড়েননি। দূরত্বের কারণে যেমন চাকরী নিয়ে শিলং যাওয়া হয়নি, তেমনি কুষ্ঠিয়া আদালতেও তিনি চাকরী পেয়েও সে চাকরী করতে পারেননি সম্ভবত পারিবারিক কারণেই। কেননা তাঁর পিতা ছিলেন কুষ্টিয়া আদালতের আইনজীবী সেইসঙ্গে শিলাইদহ ঠাকুর এস্টেটের আইনি উপদেষ্টা। তাঁর অগ্রজও ছিলেন সেই আদালতেরই উকিল এবং তৎকালীন বিখ্যাত মোহিনী মিলের নিযুক্ত আইনজীবী, এছাড়া জগদীশ বাবুর খুড় শ্বশুরও ছিলেন একই আদালতের আইন জীবী। সুতরাং সেইরকম পরিবারের পুত্র কিংবা জামাতা একই আদালত চত্বরে সামান্য টাইপিষ্ট বা কেরাণীর পদে বসে চাকরী করবেন—এটা দুই পরিবারের পক্ষেই মর্যাদার কারণ নিশ্চয়ই হয়েছিল। পারিবারিক ক্ষেত্র থেকেই এই তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় শুরু হয়েছিল জগদীশ বাবুর জীবনে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আইনজ্ঞ পরিবারের সন্তান হলেও সামান্য বৃত্তি গ্রহণে মোটেই লজ্জিত ছিলেন না। তাঁর এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাবের সমর্থন রয়েছে ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনাতেও— "... আপাত নিরীহ এবং প্রায় নীরব এই মানুষটির আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল অতিপ্রখর। এই কারণেই বারবার তাঁকে চাকরি ছাড়তে হয়েছে, চাকরি ছেড়ে অকিঞ্চিৎকর ব্যবসায় মনোনিবেশ করতে হয়েছে, নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছে এবং জনপ্রিয়তার সমস্ত প্রলোভন বর্জন করতে হয়েছে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এই অসাধারণ আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন অভিমানী মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যায়।"[১৭]

জগদীশ গুপ্তের প্রথম কর্মস্থল বীরভূমের শিউড়ি আদালত। ১৯০৮ - ০৯ সালে সিউড়ির জজকোর্টে জব-টাইপিস্ট হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এটি তাঁর স্থায়ী চাকরী ছিল না। আদালতের প্রয়োজনীয় লেখাপত্র টাইপ করে দিয়ে প্রতি শব্দ হিসেবে পারিশ্রমিক পেতেন। যা সামান্য আয় হত তাই দিয়েই সংসার নির্বাহ করতেন। এ নিয়ে তাঁর কোনো আক্ষেপ ছিল না। স্ত্রী চারুবালাও ছিলেন এব্যাপারে যোগ্য সহধর্মিণী। এযেন কালকেতু ফুল্লরার রাজযোটক। পাত্রের অভাবে ফুল্লরা ঘরের মেঝেতে পান্তা ভাত রেখে দিত। কিন্তু দাম্পত্য শান্তির বাতাবরণে সেই ভাতের স্বাদ বিন্দুমাত্র কমেনি কখনো। দারিদ্র রূপ কালবৈশাখী তাদের জীবনের সুখী গৃহকোণটির ভিত কখনো টলাতে পারেনি। চারুবালা দেবীও এহেন স্বামীর সাহচর্যে কখনোই কোনো আক্ষেপের মধ্যে দিন অতিবাহিত করেননি। এভাবেই অস্থায়ী অনিশ্চিত উপার্জন ব্যবস্থায় ৪/৫ বছর অতিক্রম করেন তাঁরা। তবে তাঁদের এই প্রথম সংসার যাত্রার সঙ্গী ছিলেন জগদীশ বাবুর মা সৌদামিণী দেবীও। মা ছিলেন একেবারে ছেলে অন্তপ্রাণ। ছয় পুত্র কন্যার মধ্যে চারজনই অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় মায়ের স্নেহের অবলম্বন ছিল কনিষ্ঠ জগদীশ। সেজন্য তিনি ছেলেকে ছেড়ে একা থাকতে একেবারেই পারতেন না। কলকাতায় ছেলে পড়তে চলে যাবার সময় মা ও ছেলের চোখের জল 'আনন্দভবন'কে বিরহাকুল করেছে। রিপন কলেজে পড়ার সময় পরীক্ষার পূর্বে যখন জগদীশবাবু টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে বাড়ীতে এসেছিলেন তখনো মা স্নানাহারের কথা ভুলে ছেলেকে নিয়েই পড়ে থাকতেন। মায়ের এই বন্ধনের কথা উত্তরকালে 'রোমন্থন' (১৯৩১) উপন্যাসে ছোটবাবুর কথার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে—
"... তোদের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে। ছোট'র ত' বিছানার চাদর শোবার আগে ঝেড়ে না দিলে সে রাত্রে আর ঘুম হয় না। তুই কেন যাচ্ছিস্ তুই থাক্। বলিয়া গৃহিণী ছোট ছেলের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ছোটবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন ঐ করেই ত তোমরা মায়েরা বাঙালী ছেলের মাথা খাও।..."[১৮] —এই মা আসলে সৌদামিনী দেবীরই ছায়ামূর্তি। স্বভাবতই বাড়ী ছেড়ে প্রথম নতুন সংসারে মা কিছুতেই পুত্র-পুত্রবধূকে একা ছাড়েননি। সেখানকার মাসিক তিন টাকার ভাড়া বাড়ীতে মাস ছয়েক থেকে সংসার গুছিয়ে দিয়ে তারপর তিনি কুষ্ঠিয়ায় ফিরে এসেছেন। আসবার সময়ও হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা বাড়ীওয়ালিকে তিনি বারবার অনুরোধ করে এসেছেন ওদের দেখাশোনা করার জন্য। জগদীশ বাবু প্রথম চাকরী পান ১৯১২ সালে—টাইপিস্ট হিসেবেই। কর্মস্থল উড়িষ্যার সম্বলপুরের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের

অফিস। মাসিক বেতন ৪০ টাকা। সিউড়ির সংসার পর্ব শেষ করে এবার তাঁরা যখন সম্বলপুরে এলেন সেখানেও সেই মায়ের বাঁধন। তবে এবারে শুধু সৌদামিনী দেবী একা নন, স্বামীকে সঙ্গী করলেন। ফলে সম্বলপুরের সংসার শুরু হয় বাবা মা এবং স্ত্রীকে নিয়ে। স্বচ্ছল না হলেও সুখের কোনো কমতি ছিল না। মাসিক সাত টাকার ভাড়া বাড়ীতে তাঁদের জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। এ যেন কুষ্ঠিয়ার আনন্দভবন এর একটু করো স্মৃতি। সেখানকার প্রতিবেশ এবং সাংসারিক চিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে চারুবালা দেবী লিখেছেন— ''... সামনে পূবের দিকে খোলা বারান্দা, বারান্দায় দাঁড়াইলে মহানদী দেখা যায়, রূপার মত সুন্দর নদীর জল। নদীর মধ্যে মাঝে মাঝে পাথরের স্তুপ দেখা যেত, তারপর নদীর ওপারে শ্রেণীবদ্ধ পাহাড় দেখা যেত, পাহাড়ের উপর অনেক বড় বড় গাছও দেখা যেত। তখন সম্বলপুরে কয়লা ছিল না, কাঠে রান্না করতে হত, কাঠ খুব সস্তা। বাজারে মাছ প্রভৃতি সব জিনিসপত্রই সস্তা।''[১৯]

সম্বলপুর কর্মস্থলটির প্রধনা অফিস ছিল রাঁচীতে। সেখানকার বড় সাহেব সম্বলপুরের অফিসে এসে জগদীশ বাবুকে রাঁচীর অফিসে বদলীর নির্দেশ দেন। সেইমত সম্বলপুরের পাট চুকিয়ে রাঁচী যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। নতুন জায়গায় নতুন করে ঘর বাঁধবার প্রস্তুতি যখন শেষ পর্বে সেই সময় পাটনা হাইকোর্ট তাঁকে কটক অফিসে নিযুক্ত করে। এরফলে রাঁচী না কটক—কোথায় কাজে যোগ দেবেন তা দিয়ে দ্বিধার মধ্যে পড়েন। সকলের পরামর্শ মতো রাঁচী যাওয়ার সিদ্ধান্ত বদলে কটকেই যাওয়া স্থির করলেন। চলেও গেলেন একদিন। কিন্তু এখানে এসে সাধ ও সাধ্যের মধ্যে প্রথমে বাড়ী খুঁজে পাচ্ছিলেন না; পরে যাও বা পেলেন কিন্তু উপার্জন প্রায় হচ্ছিলই না। কারণ এখানেও সরকারী তরফে কাজ দেওয়া হত কত শব্দ হচ্ছে সেই অনুযায়ী পরিশ্রমিকের বিনিময়ে। স্বাভাবিকভাবে অনিশ্চিত জীবন তাড়না করে জগদীশবাবুকে। সুতরাং আবার বদলীর জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন। সেই আবেদন মঞ্জুর হলে ১৯১৮-১৯ খ্রীঃ নাগাদ পাটনায় ফিরে আসেন। চাকরী সেই টাইপিস্টের। পুনরায় মাথা গোঁজবার জন্য বাড়ী অনুসন্ধান পর্ব। এবারে আর বাবা মা কেউ এলেন না। পাটনার অধ্যায় বর্ণনা করতে গিয়ে চারুবালা দেবী লিখলেন— ''খুব ভাল জায়গা। প্রথমে বাড়ী ভাড়া করলেন বাঁকীপুর গঙ্গার ধারে।... সেখানে বৎসর খানেক থাকার পর নূতন কোয়ার্টার্স হইলে আবেদন করার পর কোয়ার্টার্স একটা পাওয়া গেল। বেশ ভাল বাড়ী, প্রতিবেশী অনেক এবং সব ভদ্র পরিবার।''[২০]

পাটনা হাইকোর্টে কর্মরত অবস্থার সময়েই জগদীশ গুপ্তের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটাই বেড়েছিল। মাসে তৎকালীন অর্থের মানদণ্ডে ২০০/২৫০ টাকাও আয় হয়েছে। এই সময়েই তাঁর সখের সঙ্গীতচর্চা এবং বন্ধু-বান্ধবদের মজলিশ জমে উঠেছিল। স্বভাবে চাপা এবং অন্তর্মুখীন হলেও সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রেও যে তিনি নীরবতা পালন করতেন এমন নয়। সম্বলপুরে থাকার সময়েই পিতামাতার সঙ্গে তাঁর কিশোর ভ্রাতুস্পুত্র জ্যোতির্ময়ও গিয়েছিল। জগদীশ বাবু ভালো এসরাজতো বাজাতেনই, সেইসঙ্গে হারমোনিয়াম, বাঁশি এবং বেহালাতেও তাঁর দক্ষ হাত ছিল। জ্যোতির্ময়কে তিনি গান শিখিয়েছিলেন, জ্যোতির্ময় গান গাইত আর তিনি এসরাজ বাজাতেন। এরপর পাটনায় কোয়ার্টারে বাস কালে গড়ে উঠেছিল কনসার্ট পার্টি যাতে জগদীশ বাবু বেহালা বাজাতেন। তাঁর এই সঙ্গীতচর্চা প্রসঙ্গে স্মৃতি চারণায় চারুবালা দেবী বলেছেন— ‘‘গানবাজনায় এঁর স্ফূর্তি চিরদিনই দেখে এসেছি। সম্বলপুরেও মধ্যে মধ্যে রাত্র করিয়া বাড়ী ফিরলে জিজ্ঞাসা করলে শুনতাম হরিসভা হয় সেখানে বেহালা বাজাচ্ছিলাম। ছোটবড় সবাই এঁর বন্ধু। ... সিউড়িতেও ঐ গান বাজনার আড্ডা ছাড়া আর কোন নেশা ছিল না। ... পাটনা যেয়েও বাজনার সখ খুব।’’[২১] পাটনায় অবস্থান কালে একদিন লর্ড সিংহী সপরিবারে এসেছিলেন হাইকোর্ট পরিদর্শনে। সাদা চামড়ার শাসকের আপত্তি অগ্রাহ্য করে সেই কনসার্ট পার্টির সকলে প্যান্ট কোর্টের পরিবর্তে ধুতিচাদর পরেই পার্টিতে হাজির হলেন। সেখানে তাদের পরিবেশিত সংগীতে মুগ্ধ হয়ে লর্ড সিংহীর কন্যা কুড়ি টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছিলেন। এই বেহালাকে সম্বল করেই তিনি কখনো কখনো থিয়েটারে চাকরীর প্রত্যাশাও ব্যক্ত করতেন। এরই ফাঁকে চলেছিল তাঁর লেখালেখি। এই গানের আড্ডা প্রথম জীবনে কুষ্টিয়াতেও বসত প্রতিবেশী বন্ধু নন্দলাল সরকারের বাড়ীতে। এই বন্ধু বৎসলতার আড্ডা চিত্র তাঁর গল্প উপন্যাসে নানা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। তবে ভাবতে অবাক লাগে যিনি বেহালায় দক্ষ শিল্পী ছিলেন তিনি তাঁর জীবনের সুরটি কীভাবে একই খাতে বইয়ে দিতে পেরেছিলেন। হয়তো বেহালার করুণ সুরটাই তাঁর জীবনকে একটা নির্দিষ্ট স্কেলে আবদ্ধ রেখেছিল বলেই তিনি তাঁর রচনায় আগাগোড়া তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাই ব্যক্ত করে গেছেন।

এক ধরনের নিঃসঙ্গ প্রিয়তা ও আত্মমগ্নতার কারণে তিনি কেমন যেন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী করে তুলেছিলেন নিজেকে। কিন্তু তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে কোথায় যেন তবু একটা মানুষের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করতে চাওয়া মানুষ বাস করত। সেই অন্তরস্থ মানুষটিই

তাঁকে ‘কালিকলম’ পত্রিকায় মুরলীধর বসু, ‘কল্লোল’ পত্রিকার দীনেশ রঞ্জন দাস কিংবা ‘উত্তরা’ পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মতো মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের নিবিড়তা গড়ে তুলেছিল। এই বন্ধুর তালিকায় ছিলেন ছেলেবেলার বন্ধু ড. রাধাবিনোদ পাল — যিনি উত্তর কালের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদ এবং শিক্ষাবিদ। কর্মসূত্রে যেখানেই গেছেন সেখানে তাঁর অনেক বন্ধু হয়েছে; কোথাও কোথাও তাঁর অনুযাগীর দলও গড়ে উঠেছিল। তবে তাঁর এই আড্ডা প্রিয় স্বভাবটি সংগীতের আসরে যেভাবে প্রকট হয়েছে সাহিত্যের আসরে ঠিক ততোটাই প্রচ্ছন্ন থেকেছে। এবিষয়ে আবুল আহসান চৌধুরী জানিয়েছেন— ‘‘জগদীশ গুপ্তের ভেতরে প্রচ্ছন্ন ছিল একটা আড্ডাপ্রিয়—মজলিশি মানুষ; কিন্তু সংকোচ কুণ্ঠা-আত্মকেন্দ্রিকতা নির্লিপ্ততা অতিক্রম করে তা প্রায়শই প্রকাশিত হতে পারতো না—সঙ্গীতের মজলিশে যদিও বা তা উন্মোচিত হতে পারতো কিন্তু সাহিত্যের আসরে তা প্রকাশিত হতে পারেনি। মনে মনে কিন্তু সাহিত্যের আড্ডার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল, কিন্তু স্বভাব সংকোচের অথবা স্থান-বিচ্ছিন্নতার একটা যেন বাধা ছিল।’’[২২] এই সংকোচের বিহ্বলতা নিয়েই তিনি বন্ধুদের মাঝে মাঝে খাওয়ানোর নিমন্ত্রণ দিতেন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় চা আর সিগারেটের ধোঁয়ায় জীবনের বিচিত্র পথটা তাঁর শিল্পী চেতনা নাড়িয়ে দিয়ে দেত।

পাটনা হাইকোর্টে কাজকর্ম ভালোই চলছিল। জগদীশগুপ্ত নিয়মিতই অফিসে কাজে যোগ দিতেন। অফিসে কাজের ব্যাপারে তিনি সর্বদাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কু-নজরে যাতে পড়তে না হয় সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ কাজ করেছে। কিন্তু যা হবার ছিল তাই হতে খুব বেশীদিন সময় লাগল না। পাটনা হাইকোটের চাকুরী থেকে তিনি ইস্তফা দিলেন মূলত এই আত্মসম্ভ্রম বোধের কারণেই। স্থূল চিন্তার আর পাঁচজন মানুষের পক্ষে যে ঘটনা অত্যন্ত নগণ্য সেই ঘটনাটাই সংবেদনশীল মানুষটির কাছে অসহ্যবোধ হল। উর্ধ্বতন সাদা চামড়ার সাহেবের সঙ্গে একটি ইংরেজি শব্দ নিয়ে মতান্তর হয়। ইংরেজি শব্দটির প্রথম অক্ষর বড় হরফে হবে কি ছোট হরফে হবে তা নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত উর্ধ্বতন ইংরেজ সাহেবের কাছে অত্যন্ত ঔদ্ধত্য মনে হয়েছে—উপরন্তু একজন সামান্য টাইপিস্টের এই পণ্ডিতী মেনে নিতে পারেননি ইংরেজ প্রভুটি। পরিবর্তে জগদীশ বাবুর উপর অকারণ রূঢ় ব্যবহার অনাবশ্যক বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হয়। আজীবন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের অধিকারী প্রতিবাদী সত্তার অধিকারী এই মানুষটিও কোন অংশে কম যান না। তিনি কোনো অবস্থাতেই

মাথা নত করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে চাকরীটা ছেড়ে দিলেন। শুধু এই চাকরী নয়, জেদ ধরলেন জীবনে আর কোনোদিন চাকরীই করবেন না। চাকরী ছেড়ে তিনি কিছুদিনের জন্য কুষ্টিয়ায় আসেন। সেটা ১৯২৫/২৬ সাল। সাংসারিক স্বচ্ছলতার শীর্ষ বিন্দু থেকে তাঁকে আবার চরমতম দারিদ্র্যের মুখোমুখি নেমে আসতে হয়।

সাময়িকভাবে কুষ্টিয়ায় অবস্থানের পর জীবিকার টানে জগদীশ গুপ্ত পুনরায় কলকাতায় চলে আসেন। স্ত্রী চারুবালা গুপ্তের স্মৃতি চারণার সাক্ষ্যে আবুল আহসান চৌধুরী বলেছেন—পাটনায় থাকাকালীন জগদীশ বাবুর মাসিক আয় ছিল ২০০/২৫০ টাকা। কিন্তু ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় সেই আয় উল্লেখ করেছেন ৩৫০/৪০০ টাকা।[২৩] তবে আয়ের পরিমান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তখন তাঁদের পারিবারিক স্বচ্ছলতা নিয়ে কোন দ্বিমত ছিল না। আজ থেকে আট দশকেরও বেশী সময় আগে একটি ছোট্ট পরিবারের পক্ষে এই পরিমান অঙ্ক উপার্জন বেশ ভালোই বলা যায়। নিঃসন্তান দাম্পত্য জীবনে তাদের সাংসারিক অভাবের কোনরকম রন্ধ্র পথই ছিল না। কিন্তু তেল কমে গেলে প্রদীপের আলো যেমন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসতে থাকে তেমনি নিয়মিত উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যের আলোটাও কমে আসতে থাকে। এমতাবস্থায় চাকরি না করার শপথ যখন করেছেন জগদীশ বাবু একবার; তখন তাঁর স্বভাবের প্রকৃতি অনুযায়ী সে পথে আর হাঁটবেন না এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং বিকল্প রাস্তা হল ব্যবসা করা।

কলকাতায় বসে তখন সম্মানজনক ব্যবসা অর্থে একটা রাস্তা ছিল 'পত্রিকা' প্রকাশ করা। স্বল্পভাষী জগদীশ বাবু সেই পথেই অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশা রেখে প্রকাশ করলেন পত্রিকা—নাম দিলেন 'গুপ্তের গল্প'। তিনি নিজে তখনো লেখক হিসেবে বিশেষ পরিচিতি পাননি। তবে ছোটগল্প লেখা শুরু করেছেন। কৈশোরে নিষিদ্ধ কবিতা দিয়ে জগদীশ বাবুর যে সাহিত্য চর্চা শুরু হয়েছিল তার প্রথম প্রকাশিত রূপ একটি অনুবাদ গল্প। ১৯১১ খ্রীঃ তৎকালীন 'ভারতী' পত্রিকায় জোসেফ এ্যাডিসন রচিত 'ভিসন অব মির্জা' অবলম্বনে 'মির্জার স্বপ্নদর্শন' নামে সেই গল্পটি প্রকাশ পেয়েছে। 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত (২৯ শে ফাল্গুন ১৩৩১) 'পেয়িংগেস্ট' গল্পটিকে তাঁর প্রথম মৌলিক রচনা বলে ড. সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন। পরে এটিও তাঁর প্রথম গল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। কিন্তু এই তথ্যটি নির্ভুল নয়। তাঁর প্রথম মৌলিক গল্প 'তিনটি চুমু' — প্রকাশিত (১৭ই মাঘ ১৩৩১) হয়েছিল 'বিজলী'

পত্রিকাতেই। যদিও তাঁর প্রথম লিখিত ছোটগল্প 'জহর' — যা পরে কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। এইরকম সাহিত্য চর্চা দ্বারা তিনি সেইসময় সার্বিক পরিচিত তেমন ভাবে পাননি, অবশ্য কোনো কালেই তাঁর এইরকম পরিচিতি গড়ে উঠেনি। এর কারণ অনুসন্ধান করে ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন— "... জনপ্রিয় লেখক তিনি কোনকালেই হতে পারেননি, কারণ যে নৈর্ব্যক্তিক বস্তুধর্মিতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন — আবেগ নির্ভর সাধারণ পাঠকের কোনদিনই তা খুব প্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু পাঠকের অনীহা জগদীশ গুপ্তের মধ্যে কখনোই অনাস্থার ভাব জাগাতে পারেনি — আত্মপ্রত্যয়ে তিনি ছিলেন অবিচল।"[২৪] সেই আত্মপ্রত্যয় নিয়ে 'গুপ্তের গল্প' প্রকাশ করে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই বাস্তবটা উপলব্ধি করতে পারলেন। পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় তিনি নিজের কয়েকটি লঘুচালে লেখা গল্প প্রকাশ করতেন। কিন্তু পাঠক সেইসব লেখাকে ভালোভাবে নেয়নি বলে পত্রিকাটির ধারাবাহিক প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। লাভের মধ্যে লাভ এতটা হলো যে সঞ্চিত অর্থের কিছু অপচয় হল, আর জীবন সম্পর্কে মানুষ সম্পর্কে লেখকের বাস্তব জ্ঞানের পথটাও খানিকটা স্পষ্টতর হলো। এই পত্রিকার ভূত মাথায় না চাপলে তাঁর মতো দক্ষ টাইপিস্টের সেইসময় একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া তেমন অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ঐ যে জেদ করেছেন চাকরী আর জীবনে করবেন না সেই একগুয়েমি স্বভাবই তাঁকে আবার একটা ভুল পরিকল্পপনাকে বাস্তবায়নের পথে চালনা করল।

পাটনা হাইকোর্টে চাকরিকালে সঞ্চিত অর্থের একটা বড় অংশ পত্রিকার পেছনে চলে যাওয়ার পর জগদীশ বাবু আবার একটা নতুন উপদ্রবকে তাঁদের জীবনে আহ্বান জানালেন। ঠিক করলেন ফাউন্টেন কলমের কালি তৈরী করবেন। যেমনি ভাবনা তেমনি কাজ। যেটুকু সঞ্চিত ছিল পুরোটাই লগ্নি করে নিজে কালি তৈরী করলেন — নাম দিলেন 'Jago's Ink'। উপার্জনের তাগিদে এই পেশাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি সাময়িক ভাবে লেখালেখিও ছেড়ে দিয়েছিলেন। এসম্পর্কে 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুকে একটি পত্রে লিখেছেন— "...Ink Manufacture -এর কাজটা পুনরুজ্জীবিত করিব, স্থির করিয়াছি। Jago's Ink।

সুতরাং কালি-কলমের লেখক হিসাবে যদি আমার সাক্ষাৎ আর না পান তবে আমাকে অপরাধী কবিবেন না—ইহাই আমার সর্বান্তঃকরণের অনুরোধ।"[২৫] শুধু লেখার প্রতি মনোযোগ

না দেওয়া নয়, কালিটিকে বাজারে জনপ্রিয় করে তোলার সমস্ত রকম কৌশলের মধ্যে তিনি ডুবে যান। শহরের বড় রাস্তার পাশে দেওয়ালে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন যেমন দেওয়া হয়, তেমনি সুদূর জার্মানি থেকে কালির দোয়াত আনার ব্যবস্থাও করেছিলেন। কালিটির গুণগত মান যথেষ্ট ভালো ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিছক ব্যবসায়িক বুদ্ধি না থাকার জন্য তিনি ব্যবসা পরিচালনা করতে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই ব্যবসায় নেমে তার সর্বস্বান্ত হওয়ার কোন অবশিষ্টই আর থাকল না। উপরন্তু এই দুঃসময়েই তাঁর পিতাও মারা যান। ফলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় যেমন নিঃশেষ হয় তেমনি 'আনন্দভবন' থেকেও আর অর্থপ্রাপ্তির কোনোরকম সুযোগ থাকে না। কপর্দক শূন্য জগদীশ গুপ্তের জীবনে নেমে আসে এক সুগভীর তমসা। সেই তমসার অতলে তিনি নিয়ত ডুবে যেতে থাকেন।

ড. প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর জগদীশগুপ্ত বিষয়ক গ্রন্থে পাটনা হাইকোর্টে চাকরী ছেড়ে দেবার পর প্রথমে জগদীশ বাবু কালি তৈরীর ব্যবসায় নামেন, তারপর পত্রিকা 'গুপ্তের গল্প' প্রকাশ করেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং আবুল আহসান চৌধুরীর মত প্রথম শ্রেণীর জগদীশগুপ্ত গবেষকরা কিন্তু এর বিপরীত কথাই বলেছেন। আমি আমার আলোচনায় প্রবীর বাবুর তথ্যটিকে গ্রহণ না করে অন্য দুজনের দেওয়া তথ্যানুযায়ীই লেখকের জীবনের এই সময়ের কথা উল্লেখ করেছি। তবে পত্রিকা আগে না কালি তৈরীর ব্যবসা — এনিয়ে বিতর্ক যাই থাক না কেন, এই দুই ব্যবসায় অনভিজ্ঞতার কারণে যে জগদীশ বাবু সর্বস্ব খুইয়েছেন, সে বিষয়ে সকলেই সহমত পোষণ করেছেন। নিঃসন্তান দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী চারুবালা দেবী তাঁদের জীবনের এই সংকটাপন্ন সময়ে দাঁড়িয়ে স্বামীকে নতুন করে পথ চলার প্রেরণা যোগান। স্বভাবতই অন্ধকারময় জীবন সৈকত ভূমিতে দাঁড়িয়েও উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।

জীবনের তাগিদেই জগদীশ বাবু আপন শপথ ভেঙ্গে নব্য ভাবনার আলোকে সরে আসেন। পুনরায় আদলতের টাইপিস্টের কাজে যোগ দেন। এবারে বোলপুর আদালত চত্বর হল তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। বোলপুর আদালতে যোগদানের সময় তিনি জীবনের প্রায় উনচল্লিশটি বসন্ত অতিক্রম করে চলে এসেছেন। বিচিত্র মানুষ বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা তখন তাঁর ভাণ্ডারে। পাটনার চাকরীটা ছেড়ে দেবার পর একের পর এক গল্প লিখে গেছেন। উত্তরা-প্রবাসী-ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় লেখা দিয়েছেন কোনরকম পারিশ্রমিক ছাড়াই। এমনকী কেউ নতুন কোন

পত্রিকা বের করার জন্য লেখা চাইলে তাকেও নিরাশ করেননি। বোলপুর আদালতে তাঁর কাজের প্রকৃতি কীরকম ছিল তা স্পষ্ট নয়। শ্রী যতীন্দ্র সেন মহাশয় এই চাকরী সম্পর্কে লিখেছেন— ‘‘এরপর জগদীশচন্দ্র টাইপিস্টের কাজ আরম্ভ করেন বোলপুর কোর্টে। এই কাজ সম্ভবত নিয়মিত সচেতন নয়। যতদূর মনে হয় অর্থের বিনিময়ে কোর্টের মক্কেলদের মামলার কাগজ পত্রের টাইপরূপ নকল প্রস্তুত করে দিতেন।’’[২৬] আবার মুরলীধর বসুকে দুটি পত্রে তিনি এই সময় তাঁর গল্প না লেখার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন—

‘‘কোর্টের কাজে বেগার দিতে হয় যথেষ্ট। নূতন লোক পাইয়া ঠকাইতেছে। ভয়ে ভয়ে না বলিতেও পারি না। সকালবেলা ৭টা হইতে বিকাল ছ’টা পর্যন্ত কাজ—মাঝে ১০টা হইতে ১১টা পর্যন্ত খাওয়ার সময়।’’[২৭]

‘‘গল্প লিখিবার সময় নাই—৭টা হইতে ১০টা এবং ১১টা হইতে ৫টা পর্যন্ত অফিস। তারপর, বন্ধুদের জোর করিয়া হাকিমদের গল্প শোনানো। তারপরে হোটেলে খাওয়ার গর্ভযন্ত্রণা। যে ঘন্টাগুলি কাছারীতে কাটাই, সবগুলি কাজের এবং উৎকণ্ঠার। সুতরাং লিখিবার যে একটা সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহার এখন মূর্ছিতাবস্থা।’’[২৮]

শ্রীসেন এবং জগদীশ বাবুর পত্র দ্বয় থেকে পরিস্কার যে কোর্টের কাজের প্রকৃতি যাই হোক, সেই কাজের চাপের কাছে তাঁকে সাময়িকভাবে হলেও নতিস্বীকার করতে হয়েছে। জীবন জীবিকার তাড়নায় এছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না। এতকাল অর্থকষ্ট তাঁকে যেভাবে পীড়িত করেছিল, অর্জন করতে হয়েছিল নিয়ত তিক্ত অভিজ্ঞতা। সেই দুঃসময়ে লেখালেখি থেকে প্রাপ্ত আয় তাঁকে মুক্তি দিতে পারেনি সেই ভয়াবহ যন্ত্রণা থেকে। সেই নৈরাশ্য ও বেদনা থেকে তিনি ঐ পত্রে আরও লিখেছেন— ‘‘নিরুপায় পক্ষে যেমন তেমন একটা উপজীবিকার উপায়ের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এইটে আসিয়া পড়ায় মনটা কঠোর বাক্য এবং বন্দী দশার মধ্যেই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। গল্প অন্ন দেয় নাই, দিবে, এ আশাও দেয় নাই; কিন্তু, এই কাজটা দিতেছে।’’[২৯]

বোলপুর আদালতের কর্মসূত্রে তিনি আবার সস্ত্রীক বীরভূমের লালমাটির সঙ্গে, এখানকার মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে থাকেন। পাটনা কোর্টে চাকরী ছেড়ে যখন তিনি কুষ্টিয়ায় ‘আনন্দ ভবনে’ ফিরে গেছিলেন তখন সেই ‘আনন্দভবন’ আর নতুন করে তাঁর জীবনে আনন্দের বার্তা বয়ে আনতে পারেনি। পিতা বার্ধক্যজনিত কারণে ৭৬ বছর বয়সে

মারা গেছেন। পিতৃহীন সেই আনন্দ নিকেতনে গ্রাসাচ্ছাদনেরও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এমতাবস্থায় বোলপুরে চলে আসাটা তাঁর জীবনে নিয়তির নিদের্শের মতই অনিবার্য ছিল। এখনকার লালমাটি আর সবুজে ঘেরা জনজীবনে তখনো শহুরে বাতাস পুরোপুরি ঢোকেনি। তবে মানুষের চেতনার সবুজ ক্ষেত্রটি মূল্যবোধের অবক্ষয়ে —ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে। সেই নিদারুণ সংকটের আবর্তের মাঝে দাঁড়িয়েও তিনি খুঁজেছেন সুস্থ জলহাওয়া। ৫টি পীঠস্থানের জেলা বীরভূমকে তাঁর মনে হয়েছে একটা প্রকাণ্ড কামরূপ কামাখ্যা।

বোলপুর চৌকি আদালতে চাকরী গ্রহণ এবং সেখানে সপরিবারে অবস্থিতির কথা প্রসঙ্গে আবুল আহসান চৌধুরী লিখেছেন— ''... প্রায় সর্বস্বান্ত জগদীশকে জীবিকার প্রয়োজনে ১৯২৭ সালে আবার চাকরিতে ফিরে যেতে হয়। এই সময় তিনি বোলপুর চৌকি আদালতে টাইপিস্টের কাজ নেন। এখানে দীর্ঘ ১৭ বছর চাকরি করার পর ১৯৪৪ সালে অবসরগ্রহণ করেন।''[৩০] কিন্তু জগদীশ বাবুর স্ত্রীর দেওয়া তথ্যানুযায়ী বোলপুরে তারা ১০ বছর ছিলেন। এবং স্ত্রীর অসুখের জন্যেই জগদীশ বাবু চাকরী ছেড়ে দিয়ে বোলপুর ছেড়ে পুনরায় কুষ্টিয়া চলে যান। কালিকলমের সম্পাদক মুরলী ধর বসুকে স্ত্রীর অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে একটি চিঠিতে প্রসঙ্গত তিনি লিখেওছেন— ''আমার স্ত্রীর শরীর ভাল নাই—পেটের অসুখ আর সর্বশরীরে ব্যথা।... অনেক কষ্টে রাঁধিতেছি।''[৩১]

স্ত্রীর এই অসুস্থতা তাঁকে বড়বেশী বিচলিত করে তুলেছিল। একদিকে আদালতে প্রচণ্ড কাজের চাপ, অন্যদিকে পারিবারিক এই অস্থিরতায় তিনি প্রতিনিয়ত ছটফট করেছেন অন্তরে অন্তরে। এইখানে অবস্থান কালেই তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি সৃষ্টি করেছেন। লিখতে লিখতে মানসিক উত্তেজনা কাটাতে কখনো কখনো লেখা থামিয়ে মাঝপথে খানিকক্ষণ বেহালা বাজিয়ে নিতেন। একথা তাঁর স্ত্রীর রচনা সাক্ষ্যে জানা যায়।

১৯২৭ সালে বোলপুরে যখন শেষবারের মত টাইপিস্টের চাকরী নিয়ে এসেছেন, সেই বছরই তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বিনোদিনী'র আত্মপ্রকাশ ঘটে। 'আনন্দভবন' -এর স্নিগ্ধ শান্তির পরিবেশ থেকে 'কুঅভিলাষপূর্ণ' কবিতা রচনার জন্য যে কিশোরের নির্বাসন হয়েছিল কলকাতায়, তখনই তাঁর — ভবিষ্যৎ জীবন পথের রূপরেখা স্থির হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। তারপর পড়াশুনার মাঝেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, মাঝপথে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া, বিখ্যাত আইনজ্ঞ পরিবারের সন্তান হিসেবে সামান্য টাইপিস্টের পদে কর্মজীবনের সূচনা,

বারবার জীবিকার স্থান পরিবর্তন, মাঝে বৃত্তিরও পরিবর্তন আদালতে কর্মসূত্রে বিচিত্র মানুষকে স্বচক্ষে দেখার দুর্লভ অভিজ্ঞতা —এসব কিছু মিলিয়ে যে যন্ত্রণা জটিল জীবনধারা জগদীশ গুপ্তকে অতিক্রম করতে হয়েছে — সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতারই এক অনন্য প্রকাশরূপ তাঁর গল্প উপন্যাসগুলি। পাটনা আদালতের কাজ ছেড়ে আসার পর বেকার জীবনে ডুবে থাকা মানুষটিকে যখন আলস্য গ্রাস করছিল সেইসময় তার স্ত্রী চারুবালা দেবী তাঁর গল্প সৃষ্টির বীজ বপণ করে দেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে। 'বিনোদিনী' গল্প গ্রন্থের ভূমিকায় 'গল্প কেন লিখিলাম' —এ লেখক তার সংক্ষিপ্ত অথচ হাস্য কৌতুককর বিবরণ দিয়েছেন—যার মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্টির দুয়ার উন্মোচনের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

অলসতার মধ্যদিয়ে তিনি যখন দিন অতিবাহিত করছেন সেইসময় তার স্ত্রী নানা কাজের অজুহাতে বাজারে পাঠাতেন তাঁকে—আসা যাওয়া মিলিয়ে বাজার পুরো সওয়া ঘন্টার পথ। কোনোদিন পান, কোনোদিন কাঁচালংকা, কোনোদিন সোডা, কোনোদিন বা মউরি ইত্যাদির প্রয়োজনে তাঁকে যখন বাজারে ছুটতে হচ্ছিল, তখন তিনি একটা 'ফন্দি' অবলম্বন করলেন তাঁর 'প্রিয়ম্বদা'কে ব্যস্ততা দেখাবার জন্য। কাগজ পেন্সিল নিয়ে গল্প রচনার বাহানায় কখনো উর্ধ্বাকাশে তাকিয়ে রইলেন, কখনো চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বসে রইলেন। এই ফাঁকি ধরা পড়ে স্ত্রীর কাছে প্রকাশ পেল গল্পের অদ্ভুত সেই খসড়া—

''গল্পের প্লট্ যাহার উপর লিপিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায় ছিল, সেই কাগজখানা প্রিয়ম্বদা ফস্ করিয়া টানিয়া লইয়া সশব্দে পড়িতে লাগিলেন, শ্রী শ্রী দুর্গাপূজার ঘটনা, হাইকোর্ট, ওয়াটার-টাওয়ার; এক পয়সার মিঠেকড়া তামাক; ঢোঁড়া মিঞা; মালিনী তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়; পয়সায় দুটো শশা; বিভূতি চৌধুরী, রামনবমী; তারি সনে দেখা হ'লে; হাতুড়ে...''[৩২] স্ত্রীর সামনে লেখকের 'দুর্গতির' পথ ধরেই একটা ব্যতিক্রমধর্মী গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল সেদিন। বোলপুরে যখন কর্মসূত্রে বাস করতে শুরু করেন, তখন মাসিক পত্রের মাধ্যমে ক্রমে জানাজানি হয়ে যায় জগদীশ বাবু একজন লেখক। সেইসূত্রে তাঁর দু-চারজন গুণগ্রাহী অনুরাগী বন্ধুও জুটে গেল। এদের মধ্যে দুজন হলেন শ্রী ভোলানাথ সেনগুপ্ত এবং শ্রী শান্তিরাম চক্রবর্তী। এই দুজনের পীড়াপীড়িতে লেখক গল্পের বই প্রকাশে সম্মতি দিলেন। আর তার প্রকাশের জন্য ব্যয়ভার হিসেবে 'শ আড়াই' টাকা উপস্থিত শ্রীব্রজজন বল্লভ বসু ওরফে কানুবাবু বহন করার দায়িত্ব নেন নির্দ্বিধায়। কানুবাবুর টাকায়— 'বিনোদিনী'র আত্মপ্রকাশ

ঘটে। বিনোদিনীকে পাঠক সেদিন সেভাবে গ্রহণ করেনি। এনিয়ে লেখকের আক্ষেপ হয়তো ছিলই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী আক্ষেপ তিনি করেছেন কানুবাবুর অর্থ ধ্বংস করবার জন্য। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন—

"বিনোদিনী গল্পের বই ছাপা হইল

৩০/৩৫ খানা বই এঁকে ওঁকে দিলাম, অবশিষ্ট হাজার খানেক বই, আমার আর কানুবাবুর 'বিনোদিনী' প্যাকিং খামের ভিতর রহিয়া গেল, পরে কীটে খাইল।

লেখক এবং সামাজিক মানুষ হিসাবে আমার আর কোনো অনুশোচনা নাই, কেবল এই মানসিক গ্লানিটা আছে যে, কানুবাবুর শ' আড়াই টাকা নষ্ট করিয়াছি।"[৩৩]

বিনোদিনীর এই পরিণতি লেখকের দিক দিয়ে যতটা না বেদনাবহ তার চাইতে অনেক বেশি বেদনাদায়ক এবং দুর্ভাগ্যজনক যে সেদিনের মধ্যবিত্ত মানসিকতার পাঠককুল এই গ্রন্থকে অস্বীকার করেছিল। আসলে সমকালের যুগের আবেদনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই সেদিনের বড় অংশের পাঠকের কাছে এই গ্রন্থ এবং তাঁর লেখক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। অথচ লেখক বাস্তবপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজের দ্বিধা এবং তাঁর অভিজ্ঞতা লব্ধ মানুষের জীবনবোধের রসায়নে এতে নির্মাণ করেছেন যে শিল্পলোক তা মানব ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়েরই যথার্থ অভিজ্ঞাত—যাকে গ্রহণ করতে উত্তরকালের বাংলা সাহিত্য পাঠকের অনেকটাই সময় লেগেছিল।

মুরলীধর বসুকে ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কুষ্টিয়া থেকে জগদীশ গুপ্ত একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন।—

'উপন্যাস লেখা আমার পক্ষে দুরূহ—অসম্ভবই।'[৩৪] অথচ এই মানুষটি তাঁর বিজাতীয় জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে যখন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অসাধু সিদ্ধার্থ' রচনা করেন—এই মন্তব্যের তিন বছরের মধ্যেই তখনই তিনি প্রমাণ করেছেন মুরলী বসুকে লেখা মন্তব্য ছিল নিছক কথার কথা মাত্র। তাঁর এই প্রথম উপন্যাসের মধ্যদিয়েই তাঁর নিজস্বতার গণ্ডী নির্ণীত হয়ে যায়। কর্মসূত্রে সম্বলপুর কটক, পাটনা এবং বোলপুরের আদালতে প্রতিদিন যেসব মানুষ এবং ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন, সেগুলিরই টুকরো টুকরো দৃশ্য ও চরিত্র মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁর 'অসাধু সিদ্ধার্থ' থেকে মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০) উপন্যাসে।

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থগুলির প্রকাশ কালের নিরীখে বিচার করলে দেখা যায় প্রথম উপন্যাস ১৯২৯ খ্রীঃ প্রকাশ পায় এবং ১৯৩৯ খ্রীঃ মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির প্রকাশ ঘটে যায়। কিছু কিছু গ্রন্থ তিনি তাঁরও আগেই রচনা করেছিলেন, যেগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছে। সেদিক থেকে লেখকের ৩৫—৫৩ বছর বয়সের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে তিনি কুষ্টিয়ায় কাটিয়েছেন অনেকগুলো বছর, বোলপুরে দশ বছর। তবে তিনি তাঁর জন্মভূমি গ্রাম মেঘচামীর কথাও বিস্মৃত হননি। আসলে গ্রামীণ পরিবেশের প্রতি ছিল তাঁর সহজাত আকর্ষণ। এই গ্রাম জীবনের নানা অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। মেঘচামী গ্রামে বসেও তিনি দুটি বিশিষ্ট উপন্যাস লিখেছিলেন—এ বিষয়ে তাঁর স্ত্রী চারুবালা দেবীর সাক্ষ্য থেকে জানা যায়—

‘‘... বোধ হয় ১৩৩২ সাল হইবে সেইসময় বোলপুর হইতে ৬ মাসের জন্য অফিসে ছুটি লইয়া দেশের বাড়ী খোদ মেঘচামী গ্রামে থাকেন, সঙ্গে আমিও ছিলাম সেইসময় ‘দুলালের দোলা’ আর ‘রোমন্থন’ বই দু’খানি লেখেন।’’[৩৫]

মেঘচামী গ্রাম সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা, চন্দনা নদীর স্নেহস্পর্শে ধন্য এই গ্রামের পরিবেশই তাদের নানা রীতি-নীতি আচার-আচরণ-সংস্কার-বিশ্বাস সহ এই উপন্যাস দুটিতে উঠে এসেছে। বাস্তবিক জগদীশবাবু গ্রামকে বড়ই ভালোবাসতেন। তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টি দিয়ে দেখা গ্রাম সমাজের নগ্ন বীভৎস চেহারাটা গল্প উপন্যাসে তাই অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবেই ধরা পড়েছে। পূর্বসূরী শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের গ্রাম সমাজ চিত্রাঙ্কণের যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তাঁর উপন্যাসে; তাতে একটা পরিপূর্ণ রূপ ছিল না; সেই রূপ কাঠামো সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তা আবেগের দ্বারা প্লাবিত হয়ে যেত — সেখানে জগদীশ বাবুর গ্রাম সমাজ অনেকটাই পরিপূর্ণ ভাবনা দ্বারা ঋদ্ধ।

জগদীশ গুপ্তের অধিকাংশ রচনাতেই মূলত গ্রামীণ সমাজজীবন এবং শহরতলির জীবনই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তিনি নিজেও চাকরী সূত্রে শহরাঞ্চলের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও মূলত গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনই তাঁর উপন্যাসের বাস্তব ভিত্তি রচনা করেছে। মেঘচামী গ্রাম থেকে কুষ্টিয়া হয়ে যে জীবনের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তা শেষ হয়েছে পুনরায় কুষ্টিয়ায় এসেই। স্বাভাবিকভাবেই চারপাশে দেখা মানুষগুলিই তাঁর রচনায়, বিশেষ করে উপন্যাসগুলিতে ভিড় করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সেইসব মানুষকে কাছ

থেকে যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখার চেষ্টাও করেছেন আজীবন। সেইসব চোখে দেখা মানুষগুলি বলতে পারে লেখকের প্রকৃত ভূমিকা কোথায়। সেই মানুষগুলির চিত্র কীভাবে তাঁর মনোগহনে এঁকে নিতেন এবিষয়ে চারুবালা দেবী লিখেছেন— ‘‘... তখন তো পর্দা প্রথা ছিল। কখনো হয়তো একগলা ঘোমটা দিয়ে ওঁর সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছি। দুজন নিম্নশ্রেণীর পুরুষ বা মেয়েমানুষ রাস্তায় ঝগড়া করছে, উনি দাঁড়িয়ে পড়ে যতক্ষণ সম্ভব ঐ ঝগড়া শুনতেন। আমাকেও রাস্তায় এভাবে ঘোমটা মাথায় কলা বউ-এর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।’’[৩৬]
বাস্তবিক গ্রামকেই তিনি বড় ভালোবাসতেন। সুযোগ পেলেই তিনি মাঝে মাঝে গ্রামে চলে যেতেন। অনাবিল প্রকৃতি ঘেরা গ্রামকে নিছক রোমান্টিক দৃষ্টি দিয়ে নয়, নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে তিনি মাটির কাছাকাছি মানুষগুলিকে দেখেছেন। গ্রামে গিয়ে মনের মত মানুষ পেলে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনে তার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হত না। মেঘচামীর চন্দনা নদী ঘেরা গ্রামের বাড়ীতে আইজদ্দি নামে একজন মানুষকে তিনি পেয়েছিলেন, যার সঙ্গে তার আন্তরিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর কাছে বিচিত্র সব গল্প শুনতেন, অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে হতে মনের ক্যানভাসে নানারকম ছবিও তিনি এঁকে ফেলতেন। এই আইজদ্দি চরিত্রেরই এক ভিন্নতর প্রকাশ আমরা দেখি ‘দুলালের দোলা’ উপন্যাসের পিরু নামক চরিত্রটিতে। এইভাবে পল্লী বাংলার জীবন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস — ‘রোমন্থন’, ‘দুলালের দোলা’ এবং ‘যথাক্রমে’। এগুলিতে গ্রামজীবনের যে বীভৎস নগ্নরূপ ব্যক্ত হয়েছে —তাঁর সঙ্গে জগদীশ বাবুর প্রত্যক্ষ সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। এই ত্রয়ী উপন্যাসের প্লট তাই কোনো ভাবেই পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে যে ধার করা নয়—তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বোলপুর আদালতে চাকরী করার সময়েই শত ব্যস্ততার মাঝেই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটি রচনা করেন—‘লঘুগুরু’ (১৯৩১)। এই উপন্যাসে বর্ণিত যে অন্ধকারময় জীবন তার সঙ্গে জগদীশ বাবুর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল, ছিল ছেলেবেলাকার স্মৃতি। পতিতা পল্লীর দুর্বিসহ জীবনকে তিনি যেভাবে দেখেছেন, যে জীবন থেকে পতিতারা চাইলেও কোন ভাবেই বেরিয়ে আসতে পারত না। সুস্থ জীবনের স্বপ্ন অধরাই থেকে যেত। জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়েও তাদের পথের প্রান্তেই কাটাতে যে হোত, তার সরাসরি চিত্র তিনি আপন অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এনেছেন। উপন্যাসের সুন্দরী চরিত্রটি ছেলেবেলার সান্নিধ্য পাওয়া গিরিবালা নাম্মী রক্ষিতাটিরই প্রতিরূপ। কিংবা উত্তম যে টুকীর মধ্যদিয়ে আবার পাপের পথেই নেমে গেল সেই বিবর্তনের মধ্যে

শৈশবের সেই বিগত যৌবনা মুড়ি-মুড়কি বিক্রেতা পতিতার জীবনের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসটিকে তিনি সমালোচনার জন্য বোলপুরের আনন্দবাদী ব্যক্তিত্ব শান্তিনিকেতনের মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন গজেন্দ্র মিত্রের অনুরোধে। বইটি পড়ে এর লেখার রীতি নিয়ে প্রশংসা করলেও উপন্যাসে বর্ণিত সমাজকে বাংলাদেশের পরিচিত সমাজ বলতে অস্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ— "... এ দেশে লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল কাটালুম এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত সমুদ্র পারের বিদেশ বললেই হয়, দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতিপরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবনে পেরিয়ে ও জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন।"[৩৭]

এই জাতীয় অভিযোগ সত্ত্বেও বলা যায়, 'অনতিপরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন' পেরিয়ে লেখককে অন্যত্র যেতে হয়নি। তিনি তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার যে বৃত্তের মধ্যে এতকাল কাটিয়েছেন সেখানেই এই ছবি প্রত্যক্ষ করেছেন। পল্লী গ্রামের সোঁদা মাটির গন্ধ নিয়ে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য মানুষগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র গড়ে ওঠার ফলেই তিনি এই সমাজ প্রেক্ষাপটকে উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত জগদীশবাবু নিজেই তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন— "লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল আমাকে কাটাইতে হইয়াছে সেখানে 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' এবং 'কোমর বাঁধা সয়তান' নিশ্চয়ই আছে এবং বোলপুরের টাউন প্ল্যানিং -এর দোষে যাতায়াতের সময় উঁকি মারিতে হয় নাই, 'ও জায়গা' আপনি চোখে পড়িয়াছে।"[৩৮]

এই বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতাই তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। শৈশবে চন্দনা নদী তীরবর্তী গ্রাম মেঘচামী থেকে শুরু করে কুষ্টিয়া হয়ে নানা স্থানে 'ভ্রাম্যমান জীবন' কাটিয়ে বোলপুরে অবস্থান কালে এই মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন।

সংগীত চর্চার পাশাপাশি খেলাধূলার প্রতি জগদীশ বাবুর প্রবল আগ্রহের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই খেলার সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর কোনোরকম শুচিরায়ু গ্রস্ততা ছিল না। ফুটবল খেলোয়ার হিসেবে শুধু কুষ্টিয়াতেই নয়, তিনি প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলতে গেছেন কুমারখালি রাজবাড়ি, গোয়ালন্দেও। একবার কুষ্টিয়ার দলে কুমারখালির সঙ্গে ফুটবলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইতে তিনি শেষ মুহূর্তে দলের হয়ে গোল করে দলকে জিতিয়েছিলেন। এহেন জয়ী ফুটবলার জীবনের প্রতিযোগিতায় বারবার কেন জানি বড় বেশী

নিস্পৃহ থেকেছেন। হৈ-হল্লোড় হাসি ঠাট্টায় কাটানো এই মানুষটি ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকেন। নিজের অন্তরস্থ দুঃখ ব্যথা বেদনাকে গোপন করে রাখতেন। সুরের প্রতি অনুরাগী এই মানুষটির ব্যক্তি জীবনেই বেসুরো পদধ্বনি শোনা যেতে থাকে। একটা অনিবার্য দুঃখবাদী ভাবনা তাঁকে ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে। আনন্দভবন থেকে কর্মসূত্রে বিচ্যুত মানুষটির জীবনে যেন নিরানন্দ ধীরে ধীরে গ্রাস করতে থাকে। কদর্য মনোভাবের নানারকম স্থূল চিন্তার মানুষদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন আদালত চত্বরে কাটাতে গিয়ে তিনি বড় বেশী নিষ্প্রাণ হয়ে পড়তে থাকেন। ১৯০৯ সালে সিউড়ি আদালতে কাজ করার সময় তিনি তাঁর এক খুড়িমার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কিছুদিনের জন্য তাঁর শৈশবের গ্রাম মেঘচামীতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসেছিলেন তখনকার মারণরোগ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে। সেই জ্বরে তিনি দিনের পর দিন কাহিল হয়ে পড়েছেন, কিন্তু মা কিংবা স্ত্রীকে সেই যন্ত্রণার কথা বুঝতে দিতে চাননি। এভাবেই নিজেকে বারবার আড়াল করার চেষ্টা করতেন। তবে নিজের কষ্টের বিষয়ে যথেষ্ট দৃঢ়চেতা মানসিকতার অধিকারী হলেও প্রিয়জনদের রোগে শোকে তিনি যথেষ্ট কোমল হৃদয় বৃত্তির মানুষ যে ছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার তাঁর স্ত্রীর হাতে একটা ফোঁড়া হয়েছিল বোলপুরে থাকার সময়ে। ডাক্তার সেই ফোঁড়া অপারেশন করবার যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে ঘরের দরজা বন্ধ করে জগদীশগুপ্তকে তাঁর স্ত্রীর হাতটা ধরতে বলেছিলেন। কিন্তু স্বচক্ষে স্ত্রীর কষ্ট প্রত্যক্ষ করতে হবে ভেবে তিনি ডাক্তারের কথায় রাজী হননি। সংবেদনশীল বন্ধু বৎসল, পরিহাস-রসিকতায় বন্ধুদের সঙ্গে কাটাতে অভ্যস্ত এই মানুষটির জীবন বীণার তার যেন সহসা কেটে যায়। প্রথম জীবনের সেই প্রাণোচ্ছ্বলতা কালক্রমে তাঁর মধ্যে ম্লান থেকে ম্লানতর হতে থাকে। খেলাধূলা এবং সঙ্গীতচর্চার আসর থেকে তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে আনেন। বাহ্য আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় যেন শামুকটা তার খোলার ভেতরে ঢুকে যায়।

পাটনা হাইকোর্টের চাকরী করবার সময়েই জগদীশবাবুর মধ্যে একাকীত্ব চলে এসেছিল। বন্ধু মহলে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করেন। নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে তাঁর ভালো লাগত না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। চারুবালা দেবীর স্মৃতি চারণায় জানা যায়—

‘‘কুষ্টিয়াতে দেখেছি বন্ধুরা এসে নানারকম কথা বলত। তাঁকে দেখেছি নির্বাক। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখতে পেতাম, মানুষটার কোন সাড়াশব্দ নাই। আমি কিছু বললে

হাসতেন, কখনও বলতেন, ওরা বলুক না যা খুশি, ওরা যদি আনন্দ পায় বলে যাক। আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই।...”[৩৯]

আত্মপ্রচার বিমুখ এই মানুষটি কর্মসূত্রে বোলপুরে যাবার পরও তাঁর কাছে বন্ধু বান্ধবরা এসে নিজেদের সম্পর্কে গল্প গুজব করতেন। কিন্তু জগদীশবাবু শুধু সবার কথা শুনে যেতেন। নিজের সম্পর্কে তিনি প্রায় কিছুই বলতেন না। একদিন ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকা থেকে ‘মানি অর্ডার’ কোর্টের মধ্যে গেলে সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি বললেন ‘গল্পটল্প লিখি, তাই পত্রিকা দপ্তর থেকে টাকা এসেছে। এই মানি অর্ডারের ব্যাপারটির জন্য উপস্থিত সকলে তখন জানতে পেরেছিল—আদালতের এইসব কাজের ফাঁকে এই মানুষটি আবার সাহিত্য চর্চাও করেন। স্বভাবতই এহেন মানুষটি সম্পর্কে শ্রদ্ধা আরও অনেকগুণ বেড়ে যায়।

১৯০৮-০৯ খ্রীঃ বীরভূমের সিউড়ি আদালতে যে কর্মজীবন শুরু হয়েছিল জব-টাইপিস্ট হিসেবে — সেই জীবনের ইতি টেনে দেন জগদীশ গুপ্ত ১৯৪৪ খ্রীঃ বোলপুর চৌকি আদালত থেকে টাইপিস্ট হিসেবেই অবসরের মধ্যদিয়ে। এই দীর্ঘ সময়ের বিচিত্র কর্মের অভিজ্ঞতা মানুষটিকে যথার্থ অর্থেই পরিপূর্ণতা দিয়েছে। বোলপুর ছেড়ে এসে তিনি কুষ্টিয়ায় বসবাস শুরু করেন, তবে পৈত্রিক বাড়ীতে তিনি বেশীদিন থাকেননি। দাদা যতীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি পৈত্রিক বাড়ীর কাছেই ঘোষপাড়ায় বাড়ী ভাড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। এখানে দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্পকাল পূর্ব পর্যন্ত কাটিয়ে ছিলেন। এইসময় কুষ্টিয়া কলেজে বাংলার অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন শ্রী সুধীর রায়। ইনি জগদীশবাবুর সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। আত্মকেন্দ্রিক জগদীশবাবু কুষ্টিয়ায় সাহিত্য প্রেমী মানুষের কাছে ছিলেন ‘গেঁয়ো যোগী’র মত। তাঁকে এখানকার কোনো সাহিত্যলোচনা, সভা-সমিতিতে কেউই আমন্ত্রণ জানাত না। কিন্তু অধ্যাপক রায় উদ্যোগী হয়ে কুষ্টিয়াতে ‘চিন্তয়নী’ নামে একটি সাহিত্য গোষ্ঠী গড়ে এক আলোচনায় জগদীশবাবুকে আমন্ত্রণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু সমবেত অন্যান্যরা তাতে আপত্তি তোলেন। এবিষয়ে তাঁদের যুক্তি ছিল— ক. সাহিত্য সম্পর্কে জগদীশবাবু ভাষণ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট দক্ষ বক্তা নন এবং খ. তাঁর সাহিত্যে ছিল যৌনতার প্রবল ছাপ—যাকে এইসব তথাকথিত সাহিত্য রসিকেরা ভালোভাবে নেননি।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের কিছুকাল আগে সস্ত্রীক জগদীশবাবু কুষ্টিয়া ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন স্থায়ীভাবে। আর কখনোই তিনি কুষ্টিয়ায় ফিরে যাননি। কলকাতায় এসে প্রথমে

ওঠেন পরাশর রোডে অবস্থিত জেঠতুতো ভাইদের আশ্রয়ে। কিন্তু আজীবন প্রবল আত্মমর্যাদা বোধের অধিকারী মানুষটি সেখানে না থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই যাদবপুরের কাছে রামগড় কলোনিতে নিজস্ব বাড়ী করে উঠে আসেন। অবশ্য এই বাড়ী নির্মাণের কৃতিত্ব পুরোটাই ছিল তার স্ত্রী চারুবালা দেবীর। বাড়ী তৈরীর আগে পর্যন্ত তিনি এর বিন্দু বিসর্গও জানতেন না। স্বামীকে না জানিয়ে যথেষ্ট কাঠখড় পুড়িয়ে চারুবালা দেবী স্থানীয় মুকুল নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রায় রাতারাতি ঘর তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই বাড়ী ক্রয়ের ইতিহাসের স্মৃতিচারণায় চারুবালা দেবী জানিয়েছেন— ''১৯৫০ সালে স্বামীর বিনা অনুমতিতে পিতৃপ্রদত্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যাদবপুর সন্নিকট রামগড় কলোনীতে রিফিউজি হিসাবে জবরদস্তি জমিতে বাড়ি করি। কলোনির প্রেসিডেন্ট প্রভৃতিকে ৪৫.০০ টাকা দিতে হয়। ঘর তোলা প্রভৃতি বাবদ খরচ আলাদা। রামগড়ে যাইবার পর দেখা গেল স্বামী খুব খুশী।''[৪০] নিঃসন্তান কিন্তু সুখী এই দম্পতি তাঁদের জীবনের শেষ দিনগুলো রামগড় কলোনীর এই বাড়ীতেই কাটিয়েছেন। জগদীশবাবু আমৃত্যু অন্তরালেই থেকে গেছেন। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অধ্যাপক সরকার আব্দুল মান্নান লিখেছেন— ''... জগদীশ গুপ্তের ব্যক্তিজীবনের যেটুকু জানা যায়, তাতে মনে হয়, তিনি সাহিত্যিক বন্ধুদের আড্ডায় যেতেন না এবং নিজেকে তুলে ধরার ব্যাপারে তিনি সর্বদাই ছিলেন নির্মোহ ও অনাগ্রহী। ফলে অনিবার্য ভাবেই সাহিত্যিক হিসেবে আলোচিত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও অবলোকনের যে রীতি তা থেকে তিনি স্বভাবগত ভাবেই ছিলেন অনেক দূরে।''[৪১] এই বক্তব্যের মধ্যে পুরোপুরি সত্যতা হয়তো নেই। কেননা দক্ষিণ কলকাতায় কবিশেখর কালিদাস রায়ের পি ২৩০-৩ বসন্ত রায় রোডের বাড়ীতে 'রসচক্র' নামে একটি সাহিত্য আড্ডার আসর বসত প্রতি বুধবার। এই সভার সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সুরেন দাশগুপ্ত। জগদীশ বাবু এই সভার স্থায়ী সদস্য না হলেও এখানে নিয়মিত যোগ দিতেন যখনি তিনি কলকাতায় আসতেন। রামগড় কলোনীর বাড়ী থেকেও এই সভায় তাঁর আগমনের কথা জানা যায়। এই সাহিত্য সভায় আসা-যাওয়ার কালেই তিনি রচনা করেন 'রতি ও বিরতি', 'সুতিনী' প্রভৃতি উপন্যাস। এবং এখান থেকেই প্রকাশিত 'বারোয়ারী' উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ তিনি লিখেছিলেন। এই বারোয়ারী উপন্যাসের সম্পাদক ছিলেন কালিদাস রায়। জগদীশবাবু ছাড়া বাকী এগারোজন লেখক হলেন— শরৎচন্দ্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব,

রাধারাণী দেবী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, মনোজ বসু, বিশ্বপতি চৌধুরী, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় এবং নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। জগদীশবাবু এই উপন্যাসের নামকরণ করেছিলেন 'জয়া'। তবে সাহিত্য সভায় যোগ দিয়ে এইভাবে উপন্যাসাদি রচনা করলেও তিনি যে চিরকালই নিজেকে তুলে ধরার ব্যাপারে নির্মোহ এবং অনাগ্রহী ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে হয়।

দেশ ভাগের প্রাক্-মুহূর্তে কুষ্টিয়া ছেড়ে এসে সস্ত্রীক জগদীশবাবু যখন কলকাতার পরাশর রোডে তাঁর পিতৃব্য-পুত্রদের গৃহে সাময়িক ভাবে আশ্রয় নেন, তা অল্পদিন আগে তাঁর পিতৃব্য পুত্র শৈলেশ চন্দ্র স্ত্রী, দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলেকে সংসার সাগরে ভাসিয়ে অকালে মারা যায়। ছোট মেয়েটির বয়স তখন নয় মাস—নাম তার সাকু। এহেন অসহায় অবস্থায় তাঁরা মাতৃহারা সাকুকে তাঁদের বুকে টেনে নেন। নিঃসন্তান থাকার দুঃখটা এবার দূর হয় সাকুর ভালোবাসার টানে। সেই সময়ের স্মৃতি-চারণায় চারুবালা দেবী জানিয়েছেন—
''...আমরা এসে ছোট মাতৃহারা কন্যাটির মায়ায় পড়িয়া গেলাম। আমরা দু'জনাই আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইলাম। মাতৃহারা মেয়ে মায়ের দুধ পায় নাই। সর্বদা মা মা, আর খাইবার চেষ্টা। ক্রমশঃ একটু বড় হইয়া পায়ে পায়ে চলতে শিখেই মা মা করে আমার পায়ে পায়ে বেড়ায়। কি আর করি, যতদূর পারি, কচি মেয়ের আবদার পালন করি।''[৪২]

এই সাকুকে নিয়ে পরিবারের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং কোনরকম ঝগড়া বাধার পূর্বেই জগদীশবাবু সাকুকে নিয়ে যাদবপুরের কলোনীর বাড়ীতে চলে যান সস্ত্রীক। এই সাকুই হয়ে উঠেছিল তাঁদের আদরের কন্যা সুকুমারী ওরফে উত্তরকালে যিনি সরলা গুহ নামে পরিচিত হয়েছেন। জগদীশবাবু তাঁর আদরের কন্যা সাকুকে নিয়ে বেশ কয়েকটি গল্প ও কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন তাঁর 'আলুনী আলু' (১৯৫০) নামক উপন্যাসটিও।

ব্যক্তি মানুষ হিসেবে জগদীশবাবু সহজ সরল আড়ম্বরহীন জীবন যাপনে বিশ্বাসী ছিলেন। কোনোরকম শৌখিনতা বা বিলাসিতা তাঁর স্বভাব বহির্ভূত ছিল। সেইসঙ্গে পোষাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদির ব্যাপারেও তিনি উদাসীনই ছিলেন বলা যায়। আদালত চত্বরে কাজের যে জগৎ তাঁর ছিল সেখানে নানারকম ন্যায়-অন্যায় তিনি প্রত্যক্ষ ক'রে ক'রে জীবনটাকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন— যার প্রমান তাঁর সৃষ্টি ধারায় রয়েছে। আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্তের মধ্যেই তিনি আজীবন কাটিয়েছেন। নিজেকে অনাবশ্যক রূপে প্রকাশ করার তাগিদ কোন

কালেই তিনি অনুভব করেননি। অন্তর্মুখিতা এবং কুণ্ঠা ছিল মানুষটির স্বভাবের বড় বৈশিষ্ট্য। যেজন্য তিনি 'বিচিত্রা' পত্রিকার দপ্তরে গেলেও সংকোচ বশতঃ শেষ পর্যন্ত অচিন্ত্য সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা করেননি। দপ্তরের কর্মী ক্ষিতিশবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেই একরকম পালিয়ে চলে এসেছিলেন। পরে এই ঘটনার কথা তিনি চিঠিতে অচিন্ত্যবাবুর কাছে জানিয়েও ছিলেন। এই ভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ব্যক্তিগত পরিচিতির সূত্রে তাঁদের আড্ডা না হওয়ার জন্য দুঃখ করেছেন। এ সম্পর্কে অচিন্ত্যবাবু তাঁর 'কল্লোল যুগ' বইটির একজায়গায় লিখেছেন— "...একবারও কুণ্ঠার চৌকাঠ পেরিয়ে অন্তঃপুরে না এলে আড্ডা জমাই কী করে? খবর পেলে আমি হয়তো যেতাম কিন্তু সেখানে গিয়ে আড্ডা বসালে সেটা তো আর বিচিত্রা অফিসের আড্ডা হত না।"[৪৩] জগদীশবাবুর এই কুণ্ঠার কথা সাগরময় ঘোষের স্মৃতিচারণাতেও আমরা পাই। সম্পাদকের বৈঠকে বইতে সাগরময় ঘোষ জানিয়েছেন—একবার তিনি জগদীশগুপ্তের কাছে জানতে চেয়েছিলেন অনেক কবি লেখকরাই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে চান, নানা পরামর্শ আশীর্বাদ নিয়ে আসেন। অথচ অতো কাছে থেকেও জগদীশবাবু শান্তিনিকেতনে যেতেন না কেন। এর বিনীত উত্তর জগদীশ গুপ্ত দিয়েছেন সাগরময় ঘোষকে। সেই উত্তরের দুটি বিচ্ছিন্ন অংশ এরকম—

ক. "প্রতিদিন ভোরে উঠে আমি সূর্য প্রণাম করি। আসলে সে প্রণাম কবিগুরুর উদ্দেশ্যেই। তবে কি জানো, অতবড় একজন মহাপুরুষের কাছে আমার যেতে বড়ই সংকোচন হয়। আমার মুখ দিয়ে তো কথাই বেরুবে না।"[৪৪]

খ. "... আসলে তো আমি লেখকই নই। লেখক হতে গেলে যে নিষ্ঠা, যে সাধনা, যে অনুশীলনের প্রয়োজন আমি তার কিছুই করিনি। তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, স্রেফ ফোকটে আমি লেখক হয়ে পড়েছি। আমার এই জোচ্চুরিটা পাছে ধরা পড়ে যায় সেই কারণেই কোথাও যেতে আমার এত ভয়।"[৪৫]

—বস্তুতঃ এইসব স্বীকারোক্তি যে তাঁর অতি বিনয়েরই প্রকাশ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আসলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নির্মোহ ভাবনাই তাঁকে এই প্রকৃতির মানুষ করে তুলেছিল। এই বাগাড়ম্বরহীন বিনয় ও নম্রতা শুধু নিজের ব্যক্তিসত্তা কিংবা লেখক সত্তা সম্পর্কেই নয় নিজের লেখালেখি সম্পর্কেও তিনি কখনোই কোনোরূপ অহংবোধের কথা ভুলেও উচ্চারন করেন নি।

জগদীশ গুপ্তের আপাত শান্ত-সংযতবাক্ রাশভারী স্বভাবের অন্তরালে ফল্গুস্রোতের মতো একটি রসিক ও বন্ধুবৎসল মনও ছিল। বিচ্ছিন্ন দু-একটি ঘটনার মধ্যদিয়ে সেই রসিক চিত্তের পরিচয় ফুটে উঠেছে। একবার 'কালি-কলম' -এর সম্পাদক তথা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুরলীধর বসু কুষ্টিয়ার বাড়ীতে বেড়াতে আসতে চেয়েছিলেন। উত্তরে জগদীশবাবু তাঁর অক্ষমতার কথা অত্যন্ত রসিকতার ছলে ব্যক্ত করে লিখেছিলেন— ''...আমাকে বোধহয় বড় জোর বসিয়া গল্প করিতে হইবে—বেড়াইতে পারিব না।''[৪৬]

এই মুরলী বসুকেই আরেকবার একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে বিভিন্ন পত্রিকায় তো তাঁর গল্পটল্প—ছাপা হচ্ছে, কিন্তু বিনিময়ে তিনি কোনো সাম্মানিক পাচ্ছেন না। এই সাম্মানিক বা পরিশ্রমিক কথাটার পরিবর্তে জগদীশবাবু অত্যন্ত মজার ছলে 'দক্ষিণা' শব্দটি লিখে তার পাশে উঁচানো বুড়ো আঙুলের একটি ছবিও এঁকে দিয়েছিলেন। যেন গল্প ছাপাবার পর দক্ষিণা হিসেবে কিছুই না দিয়ে পত্রিকাগুলি তাঁকে 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ' দেখাচ্ছে। প্রবল রসবোধ ছাড়া এই কাজ করা সম্ভব নয়। সেইসঙ্গে গোয়েন্দা গল্প রচনাকে কেন্দ্র করে প্রকাশককে পাঠানো 'ছিন্নমস্তা' তাঁর যে ছবির কথা পূর্বে বলা হয়েছে—সেই বর্ণনার মধ্যেও আমরা আপাত নীরস লোকটির মধ্যে একজন নিখুঁত হাস্যরসিককে খুঁজে পাই। আসলে আতিশয্য ও উচ্ছ্বাসহীন, অকপট বক্তব্য তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিল। কোনোরূপ ভান ভণিতা' তিনি করেননি। এপ্রসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে তিনি লেখক হয়ে ওঠার যে গল্প শুনিয়েছেন—সেই কাহিনীকে চারুবালা গুপ্ত নিছক 'ফাজলামী' বলে উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র লেখক হিসেবেই নয় স্বামী হিসেবেও তাঁর আপাত শান্ত স্বভাবের আড়ালে রয়েছে একজন ভীষণ রসিক মানুষ। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রবল ঝগড়া বলতে যা বোঝায় সেটা কোন কালেই হয়নি। তবে সাংসারিক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে স্ত্রী রাগ করে থাকলেও জগদীশবাবু তৎক্ষণাৎ সেই 'মানভঞ্জন' করতেন অত্যন্ত মজাচ্ছলে। এবিষয়ে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে চারুবালা দেবী লিখেছেন— ''...এমনিতেই খুব কম কথার মানুষ হলেও আসলে ছিলেন ভীষণ রসিক। আমি কখনও রাগ করলে কানের কাছে বেহালা এনে গ্যাঁ গ্যাঁ করে বাজাতেন। বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারতুম না, হেসে ফেলতুম।''[৪৭]

এইসব ঘটনা ছাড়াও 'বিনোদিনী' গল্পগ্রন্থে 'গল্প কেন লিখিলাম' শীর্ষক কৈফিয়ৎ মূলক লেখাটিতে তাঁর লেখক হয়ে ওঠার যে অভিজ্ঞতাটি লিপিবদ্ধ করেছেন সেটা তাঁর হাস্যরসিক

মনেরই পরিচায়ক। তাঁর স্ত্রী যখন অলস মানুষকে দেখতে পারতেন না, তখন সেই আলস্যকে সঙ্গী করেই জগদীশবাবু লেখালেখি শুরু করেছিলেন।

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস এবং আচার-আচরণ বিষয়ে জগদীশবাবু প্রায় নির্লিপ্তই ছিলেন বলা যায়। তাঁর মধ্যে কোনোরূপ গোঁড়ামী ছিল না। সনাতন হিন্দু-ধর্ম এবং শাস্ত্র প্রথার প্রতি তাঁর এই ভাবনার কথা জানাতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী চারুবালা দেবী জানিয়েছেন— ‘‘কোনোরকম সংস্কার ওর মধ্যে কখনো দেখিনি। এমনকি ঠাকুর দেবতা সম্পর্কেও ওর কোনো বাড়াবাড়ি কখনো দেখিনি।’’[৪৮] তবে ব্যক্তিগত জীবনে এই ধর্মাধর্ম বিষয়ে তাঁর উদারতা এবং উদাসীনতা যাই থাক না কেন —তাঁর সৃষ্ট-সাহিত্যগুলির মধ্যে অবগাহন করলে বোঝা যায়—ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ইতিবাচক মোটেই ছিল না, বরং খানিকটা নেতিবাচকই ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অনেক বিতর্কিত কথা সরাসরি না বলে কমলাকান্ত চক্রবর্তীর মত চরিত্র সৃষ্টি করে তার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, তেমনি জগদীশবাবুর সৃষ্ট এরকম একটি চরিত্র অচ্যুতানন্দ। এই নামটিকে সামনে রেখে জগদীশগুপ্ত বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন। এইসব কবিতায় তাঁর জীবনদর্শনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। ঈশ্বরে না বিশ্বাস থেকেই এরকম একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

‘‘অর্থাৎ যখন নিজের চেষ্টায় হালে পায় না পানি
তখন আমরা রঙ্গভূমে ভগবানে টানি...
কল্পনা তা শুধু—, কল্পনাতেই পাই
নিরালম্ব নিমজ্জমান প্রাণের একটা ঠাঁই।’’[৪৯]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহকে আইন সম্মত করার আপ্রাণ লড়াইয়ে ব্যস্ত সেইসময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের সূর্যমুখী চরিত্রকে দিয়ে বিদ্যাসাগরকে মুর্খ বলিয়েছেন — একইভাবে জগদীশবাবু তাঁর উপন্যাসের চরিত্র দ্বারাই বাংলাদেশের সমাজে বিবাহ সনাতন হিন্দুধর্মের সম্পর্কে তাঁর ভাবনা চিন্তাকে ব্যক্ত করে দিয়েছেন—

ক. ‘দুলালের দোলা’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীরদবরণ সরকার হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বলেছিলেন—‘‘... শাস্ত্রে প্রথায় গরমিল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে পদে পদে গরমিল, কাজে কথায় গরমিল — চারিদিককার অসংখ্য সেই গরমিলের গোলক ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিবার অনিচ্ছাতেই আরো দশজনের মত, আমিও হিন্দুর, এমন কি মানুষেরই ধর্মাধর্ম আচার-বিচার বিষয়ে একেবারে নিস্পৃহ।’’[৫০] এই উক্তির মধ্যে লেখকের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

জগদীশ গুপ্ত তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়েছেন যাদবপুরের নিকটস্থ রামগড় কলোনীর বাড়ীতেই। স্ত্রী এবং পালিতা কন্যা সুকুমারীকে নিয়ে একরকম কেটে যেত তাঁর দিনগুলি। এই সময় ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমতে শুরু করে। এই অবস্থাতেও তিনি লেখার জন্য কতটা আকুল ছিলেন, সেটা তাঁর স্ত্রীর সাক্ষ্যেই জানা যায়— ‘‘আমরা যখন রামগড়ে বসবাস শুরু করলাম আমার স্বামীর দৃষ্টিশক্তি তখনই বেশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তবু এরই মধ্যে দিনে রাতে লিখে উনি দুটো উপন্যাস শেষ করেন। ... যখনই সময় পেতেন, তখনই লিখতেন। অবসর সময়ে সন্ধ্যে-টন্ধের দিকে বসে এস্রাজ বাজাতেন।’’[৫১]

আসলে তাঁর শরীর স্বাস্থ্য কোনকালেই বিশেষ ভালো ছিল না। ছেলেবেলায় ঘি অধিক পরিমানে খাওয়ার ফলে লিভারটা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে যাওয়ায় লিভারের বিভিন্ন উপসর্গে প্রায়ই ভুগতেন। এছাড়া তাঁর ছিল উচ্চ-রক্তচাপ—যা তাঁকে প্রায়ই যন্ত্রণা দিত। অম্লশূলের ব্যথাও ভোগ করতে হত প্রায়ই। পাটনায় থাকাকালীন আরেকটি নতুন সমস্যা যোগ হয়েছিল—তীব্র মাথাধরা। এসব নিয়ে জরাজীর্ণ মোটর গাড়ির মত চরাই-উৎরাই সমন্বিত জীবন পথ তিনি অনায়াসেই অতিক্রম করেছেন। শেষ বয়সে চোখে ছানি পড়ায় লেখা বা পড়া একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। কাউকে কাছে পেলে তাকে দিয়ে দু-একটা কবিতা লিখিয়ে নিতেন। লেখালেখি করার জন্য ছটফট করতে থাকতেন। আর প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, তাঁর লেখাগুলি যদি কেউ তাঁকে পড়ে শোনাত। এত অসহনীয় অবস্থাতেও তিনি ডাক্তার দেখাতে চাইতেন না। চোখের ছানি অপারেশন করানোর কথা বললেও রাজি হননি। লিখতে বা পড়তে না পারার জন্য অবসাদে আক্রান্ত হন। একথার সমর্থন রয়েছে আবুল আহসান চৌধুরীর লেখায়— ‘‘দৃষ্টিক্ষীণতা, শারীরিক অসামর্থ্য ও যোগ্য স্বীকৃতি সম্মানের অভাবে তাঁর লেখক মনে অবসাদ ও ক্লান্তি জমেছিল, লেখার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন।’’[৫২]

এহেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি নিজের শরীর সম্পর্কে খুব একটা যত্ন নিতেন না এবং কাউকে বিব্রতও করতেন না। ক্ষীণদৃষ্টির কারণেই একদিন বিছানা থেকে নামবার সময় নিচে পড়ে যান এর ফলে তাঁর হিপ বোন ভেঙ্গে যায়। এই অবস্থায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে তাঁর জেঠতুতো ভাইয়ের পরাশর রোডের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্লাস্টার করা অথর্ব দেহটাকে নিয়ে আর নড়াচড়া করতে পারেন না, বুকে দোষ ধরা পড়ে, আক্রান্ত হন নিউমোনিয়ায়। শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। এবং যাবতীয় প্রচেষ্টাকে বিফল প্রমান করে

‘অনুপস্থিত’ মানুষটি নীরবেই চলে যান ১৯৫৭ খ্রীঃ ১৪ই এপ্রিল।

তথ্যসূত্র :

১. জগদীশ গুপ্ত (১৯৮৬—১৯৫৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭, পৃ. ৯।

২. বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা— জগদীশ গুপ্ত, ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বরাণী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, পৃ. ১০৯।

৩. বেস্ট বুক্‌স্‌, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯২, গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৭।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৫. বিচিত্র মানুষ ঃ বিচিত্র জীবন, জগদীশ গুপ্ত, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ২০।

৬. জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে, পৃ. ১৭।

৭. জীবনানন্দ : গোপালচন্দ্র রায়, পারুল, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩।

৮. কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী, প্লাটিনাম জুবিলী স্মারক গ্রন্থ ঃ সম্পাদনা আবুল আহসান চৌধুরী, ডিসেম্বর, ১৯৮৫, পৃ. ৫১।

৯. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ), দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশকালের উল্লেখ নেই।

১০. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (চতুর্থ পর্যায়), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২৭৪।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০ ।

১২. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্র.ভা), বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

১৩. চারুবালা গুপ্ত ঃ জগদীশ গুপ্তের জীবনকথা, ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি’, কার্তিক-পৌষ, ১৩৮০, পৃ. ২৭২।

১৪. সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কার্তিক-পৌষ ১৩৮০, চারুবালা গুপ্ত ঃ জগদীশ গুপ্তের জীবন কথা, পৃ. ২৭২।

১৫. জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬—১৯৫৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।

১৭. জগদীশ গুপ্ত, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ২১।

১৮. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, পৃ. ১৬০।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

২১. প্রাগুক্ত পৃ. ২৭৯।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

২৪. বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশগুপ্ত, পৃ. ১১০।

২৫. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম ভাগ, পত্রগুচ্ছ, পৃ. ৬০৬।

২৬. জগশীশ গুপ্ত : আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৫।

২৭. পত্রগুচ্ছ, পৃ. ৬১৩।

২৮. পত্রগুচ্ছ, ঐ, পৃ. ৬১৪।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ। ৬১৪।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৩১. পত্রগুচ্ছ, পৃ. ৬১৬।

৩২. জগদীশগুপ্ত, রচনাবলী, পৃ. ৪৩৫।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৩৪. পত্রগুচ্ছ, পৃ. ৬০৮।

৩৫. চারুবালা দেবীর খাতা থেকে গৃহীত।

৩৬. স্ত্রীর চোখে লেখক জগদীশগুপ্ত, বারোমাস শারদীয়া ৮, অশোক সেন সম্পাদিত, পৃ. ৪৫।

৩৭. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (প্রথম ভাগ), পৃ. ৪৩৭।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮।

৩৯. সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৮০-২৮১।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।

৪১. জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ, পৃ. ১৫।

৪২. সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৮১।

৪৩. কল্লোল যুগ, পৃ. ১৪৮।

৪৪. সম্পাদকের বৈঠকে, পৃ. ১৪২।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

৪৬. জগদীশ গুপ্ত, পৃ. ২৭।

৪৭. বারোমাস, পৃ. ৪৪।

৪৮. বারোমাস, পৃ. ৪১।

৪৯. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ২০৬।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

৫১. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫১৯।

৫২. জগদীশ গুপ্ত, পৃ. ৩৭।